আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত আহ্বান

অনুবাদ ও সংকলন
মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

০১. পূর্বকথা # ০৭
০২. যারা কুরআনের পাঠক তাদেরকে বলছি # ১৩
০৩. যারা হাদীস পড়েন তাদেরকে বলছি # ১৪
০৪. আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ করার জন্যে যারা সংগ্রাম করছেন তাদেরকে বলছি # ২০
০৫. মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে বলছি # ২১
০৬. সফল সুনাগরিক যারা হতে চায় তাদেরকে বলছি # ২২
০৭. পৃথিবীর নামে আকাশের হাদিয়া # ২৩
০৮. হে আরব তরুণ! স্পষ্ট ভাষায় শুনে নাও, ...# ২৪
০৯. আরব যুবকদের ত্যাগ-বিসর্জনই মানব-সৌভাগ্যের সেতু-বন্ধন # ২৫
১০. মুসলিম উম্মাহ্ এবং উম্মাহ্র নেতৃত্বে যারা আছেন তাদেরকে বলছি # ৩২
১১. দক্ষ দা'ঈর শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের হাসিল করতে হবে # ৩৩
১২. নতুন ও সংস্কারধর্মী কিছু করতে হলে দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থাকতে হবে # ৩৪
১৩. উম্মাহ্র দেহে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে # ৩৬
১৪. সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে প্রয়োজনীয় আরো বেশী যোগ্যতার,...# ৩৮
১৫. কুরআন ও সীরাতে মুহাম্মদ (সা) হচ্ছে দুই মহাশক্তি # ৪০
১৬. গোটা মানবতাকে ঋণী করেছে মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাব # ৪১
১৭. মানবতার সম্মান ও মূল্যায়ন করতে হবে # ৪২
১৮. মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো? # ৪৩
১৯. ইসলামী তরবিয়তের চিত্র # ৪৪
২০. জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় হওয়ার উত্তম পন্থা # ৪৫

২১. শূন্যস্থানটি আরব মুসলমানই পূরণ করতে পারে # ৪৬
২২. ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না # ৪৭
২৩. দা'ওয়াত ও আমলের পদ্ধতি # ৪৮
২৪. জাহেলিয়াতের আঁধার চিরে এসো ইসলামের পথে # ৪৯
২৫. মুসলিম বিশ্বের সংকট # ৫০
২৬. ভয়াবহ শূন্যতা এবং দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত সেই বিচক্ষণ ব্যক্তি # ৫০
২৭. বর্তমান যুগে দাওয়াতি কার্যক্রমে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব # ৫৩
২৮. তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল... # ৫৪
২৯. আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের চূড়ায় আরোহণ করতে হবে আমাদের # ৫৫ .
৩০. সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা # ৫৯
৩১. আজ আমরা হতাশা ও বিস্ময়ের সম্মুখীন # ৬০
৩২. বুযুর্গানের ছোহবতের কোন বিকল্প নেই # ৬১
৩৩. আল্লাহ্ওয়ালাদের নিকট উপস্থিত থাকায় লাভ # ৬১
৩৪. তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব # ৬১
৩৫. ইসলাম যে কত বড় নেয়ামত! তার মূল্য বুঝতে হবে আমাদের... # ৬২
৩৬. দীনী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে বলছি # ৬৩
৩৭. সম্পর্ক, সাধনা ও আল্লাহ্-প্রেম # ৬৫
৩৮. আজকের নতুন ফিতনা # ৬৭
৩৯. নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি # ৬৯
৪০. আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা # ৭২
৪১. কেন এ হীনমন্যতা? কোথায় আত্মমর্যাদা? # ৭৪
৪২. যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে # ৭৭
৪৩. দীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন # ৭৮
৪৪. দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে # ৭৯
৪৫. আরবী ভাষার গুরুত্ব # ৮২
৪৬. নতুন যুগের নতুন ফিতনা # ৮৩

৪৭. দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে হলে অধিকতর উপকারী হতে হবে # ৮৪
৪৮. কামাল ও পূর্ণতা কাকে বলে? # ৮৭
৪৯. যোগ্য হোন, দেওবন্দ ও নাদওয়া-ই আপনাকে ডাকবে # ৮৮
৫০. দীনী যোগ্যতা অর্জন করুন # ৮৯
৫১. দয়াপ্রার্থী কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না # ৯০
৫২. উস্তাদকে জীবনের মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করুন # ৯০
৫৩. স্বজাতির ভাষায় দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্য আদায়ে এর ভূমিকা # ৯০
৫৪. 'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'-এ দু'টি গুণ আপনার জীবন পাল্টে দিতে পারে # ৯০
৫৫. বাংলাদেশী বন্ধুদেরকে বলছি # ৯২
৫৬. দেশের ভাষা ও সাহিত্যের বাগডোর হাতে নিতে হবে # ৯৩
৫৭. বহুরূপী শয়তানী জাল ছিন্ন করুন, সর্বত্র ইসলাম নিয়েই শুধু গর্ব করুন # ৮৬
৫৮. মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারীদের উদ্দেশ্যে বলছি # ৯৮
৫৯. প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে # ১৯২
৬০. আপনাদের এ জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং... # ১০৩
৬১. দাওয়াতী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যাদের প্রভাব অনস্বীকার্য # ১০৫
৬২. পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চার মাধ্যমে এ দেশের সম্মান বাড়াতে হবে # ১০৫
৬৩. সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে # ১০৭
৬৪. চিন্তা ও বুদ্ধির উত্তম চাষাবাদ স্বদেশের মাটিতে নিতে হবে # ১০৮
৬৫. আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুণ # ১০৯
৬৬. আপনাদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে # ১১০
৬৭. কাঁটার বদলে আমাদেরকে ফুল ছিটাতে হবে # ১১১
৬৮. চাকরিজীবী ভাইদেরকে বলছি # ১১৩
৬৯. দ্বীনি শিক্ষিতদের বলছি # ১১৪
৭০. নিজেকে চিনো, সময়কে বুঝো # ১১৫
৭১. দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী # ১১৬
৭২. হে তরুণ! শোন, স্পেন কেন আমাদের হাতছাড়া হলো? # ১১৯

৭৩. রাজ-ক্ষমতা আসল নয়; চরিত্র ও স্বকীয়তার মাধ্যমেই... # ১২০
৭৪. দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি # ১২১
৭৫. আমাদের জাতীয় ব্যক্তিসত্তা ও জীবনাচারের দুর্বলতাসমূহ দূর করতে হবে # ১২২
৭৬. ষড়যন্ত্রই সব কিছু নয় # ১২৩
৭৭. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহাবীদের মত নীতিবান হতে হবে # ১২৪
৭৮. নেতৃত্ব আপনাকে খুঁজবে # ১২৫
৭৯. তারুণ্যের উপহার # ১২৬
৮০. হৃদয় থেকে বলছি # ১২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যারা কুরআনের পাঠক তাদেরকে বলছি

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি মজবুত সম্পর্ক সৃষ্টি এবং কুরআনের রুচি আস্বাদনের ক্ষেত্রে এ লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ মহাগ্রন্থ থেকে যথাসম্ভব বেশী কীভাবে উপকৃত হওয়া যায়, এর মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা যায় এবং কুরআনের পথে চলে একের পর এক মহান আল্লাহ্‌র তাওফীক লাভে কীভাবে ধন্য হওয়া যায়; এ বিষয়ে কুরআনের পাঠকদেরকে আমি সবসময় নিম্নোক্ত আন্তরিক পরামর্শটা দিয়ে থাকি।

কুরআনুল কারীমের মধ্যেই যথাসম্ভব নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে। কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি কুরআনুল কারীম যথাসম্ভব কীভাবে বেশী বেশী তিলাওয়াত করা যায় এবং কুরআন পড়ে কীভাবে মজা পাওয়া যায়, এর জন্যে কুরআনের পাঠককে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। কুরআনের অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

পাঠকের যদি প্রয়োজনীয় আরবী ভাষাজ্ঞান থাকে এবং নিজেই সরাসরি কুরআনের অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়, তা হলে সরাসরি নিজেই কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। অন্যথা, কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর ও টীকা-টিপ্পনীর শরণাপন্ন হতে পারে। সর্বদা চেষ্টা এটাই থাকবে, যেন কুরআনুল কারীম বেশী বেশী তিলাওয়াত করে, কোন মানুষের ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই যেন সরাসরি কুরআনের অর্থ বুঝতে পারে। অর্থ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং বড় বড় তাফসীর গ্রন্থের খুব বেশী আশ্রয় না নিয়ে কুরআনের অমীয় স্বাদ উপভোগ করতে পারে। আর মহান আল্লাহ্ যে এতটুকু কুরআন তিলাওয়াত করার, কুরআনের অর্থ বুঝার তাওফীক দিয়েছেন এর জন্যে তাঁর দরবারে সপ্রশংসা শুকরিয়া আদায় করবে।

এক্ষেত্রে সংশয় নিরসনের প্রয়োজন ছাড়া বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিংবা প্রচলিত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক বিজ্ঞানপ্রসূত রাজনৈতিক, সামরিক অথবা আঞ্চলিক ও দলীয় বিভিন্ন চিন্তাধারা অনুযায়ী রচিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন পানির কূপের ওপর যেমন পত্র পল্লব বিশিষ্ট ঘন বৃক্ষের ছায়া আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি অনেক সময় মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান, বুদ্ধি, নেতৃত্ব ও দলীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ছায়া কুরআনের স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন উৎসের ওপর আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন সেই মাধুর্য ও স্বাদ, সেই মৌলিকত্ব ও স্বচ্ছতা আর অবশিষ্ট থাকে না, যা কুরআনুল কারীমের মূল রূহ ও প্রাণ।

বরং অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, পাঠক অনেক সময় মহান আল্লাহ্‌র মূল কালামের চেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়ে যায় কোন কোন প্রতিভাবান ও বিচক্ষণ মানুষের কালামের দ্বারা। কখনো কখনো পাঠক সেই ব্যাখ্যা ও তাফসীরকারের প্রতি পূর্ব থেকেই মুগ্ধ থাকে। ফলে কুরআনের পাঠকের চিন্তা-চেতনায় এ ভাবনা জন্ম নিতে থাকে যে, যদি অমুক মুফাসসিরের এ ব্যাখ্যা, এ তাফসীর না হতো তা হলে কুরআনের কাঙ্ক্ষিত এই সৌন্দর্য প্রকাশিত হতো না; বিকশিত হতো না কুরআনের এ মাহাত্ম্য, এ উৎকর্ষতা এবং এ গাম্ভীর্যতা। তাই বিশেষ কোন মানুষের করা তাফসীরের দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা কোন দা'য়ী, নেতা, কোন ব্যাখ্যাকার ও মুফাসসিরের দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করার মানসিকতা এবং সেই আলোকে কুরআন পড়া ও বুঝার অভ্যাস যথাসম্ভব পরিত্যাগ করতে হবে।[১]

যারা হাদীস অধ্যয়ন করেন তাদেরকে বলছি

রাসূলুল্লাহ (সা)-র হাদীস শরীফ অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকার, তা হচ্ছে নিয়ত পরিশুদ্ধকরণ। হাদীসের গ্রন্থগুলো আরম্ভ করতে হবে একনিষ্ঠতা ও আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াবের প্রত্যাশায়। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক দীনী দায়িত্ব, অনেক কাজ-কর্ম যা মানুষ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই করে থাকে, ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশার সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। কারণ, স্বভাব, সমাজ কিংবা পরিবেশের প্রভাবে মানুষের নিয়তের মধ্যে গরমিল এসে পড়ে। অনেক সময় মানুষ অন্যের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্যেও ইবাদত করে থাকে। আবার লোক দেখানোই ইবাদতের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায় অনেক সময়। তাই সে সব দীনী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো অথবা শারীরিক ইবাদত সমূহের সাথে একমাত্র সওয়াবের নিয়ত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের ভাবনাকে তাজা করার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে এমন একটি উক্তি করেছেন, যা একজন আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট নবীর পক্ষেই সম্ভব; যিনি মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতার দিক সম্পর্কে অবগত এবং জানেন মানুষের মনে নানা ধরনের কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনা সৃষ্টির সমূহ পথ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন।

'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের প্রত্যাশায় রমযানের রোজা রাখবে তার পূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সওম, 'মান সামা রমাযানা ঈমানান ওয়া ইহ্‌তিসাবান' অধ্যায়।)

১ আল্লামা নদভী রহ. রচিত 'ইলা দিরাসাতিল কুরআনিল কারীম' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

রাসূল (সা) আরো বলেছেন,

'যে ব্যক্তি কদরের রাত ঈমান ও সওয়াবের প্রত্যাশায় ক্বিয়ামুল লাইল তথা রাত্রিকালীন সালাত আদায় করবে তার পূর্বের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' [সহীহ বুখারী, কিতাবুস সওম, 'ফাদলু লাইলাতিল ক্বাদর' অধ্যায়।]

অতএব, যেখানে রমযানের রোজা রাখা এবং ক্বদরের রাতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যাপারে আশঙ্কা করা হয়েছে– অথচ এসব ইবাদতের মধ্যে কষ্ট আছে, সাধনা করতে হয় এবং এসব একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্যেই প্রবর্তিত; লোক দেখানোর সুযোগ কমই থাকে– সেখানে অন্যান্য কাজ ও কর্মব্যস্ততার কথা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য কর্মব্যস্ততার মধ্যে তো অনেক ধরনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকারিতা জড়িত থাকে।

এ জন্যে এসব কাজ অর্থাৎ হাদীস শরীফ অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সওয়াবের প্রত্যাশাই যেন হয় মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে উপকৃত হয়ে তার প্রচার-প্রসার এবং তার আলোকে সমাজ পরিচালনার দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই বাণীর ওপর আমলের নিয়ত থাকতে হবে। যাতে তিনি (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তাআলা সেই ব্যক্তির চেহারাকে তরতাজা করুক, যে আমার কাছ থেকে কোন বাণী শুনেছে, অতঃপর তা যেমন শুনেছে হুবহু অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছে। সুতরাং, অনেক ব্যক্তি যাদের নিকট হাদীস পৌছানো হয়েছে, তারা মূল শ্রোতা থেকে বেশী সংরক্ষণকারী ও অনুধাবনকারী হয়ে থাকে'। [জামে তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলেছেন।]

ইমাম বুখারী (র) অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ 'বুখারী শরীফ' আরম্ভ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তাওফীকপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত প্রিয় হাদীস দিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের শুভ সূচনা করেন ঃ

'সমস্ত কাজ-কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' মানুষের নিয়ত অনুযায়ী তার কর্মফল নির্ধারিত হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার লক্ষ্যে হিজরত করবে, তার হিজরত সেভাবেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে করেছে। [সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান।]

প্রজ্ঞাপূর্ণ এ শুভসূচনার মাধ্যমে ইমাম বুখারী (র) দু'টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি যে বিশুদ্ধ হাদীসগুলোকে একত্রিত করে হাদীস শাস্ত্রের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্যে বিশুদ্ধ পন্থায় সংকলন করেছেন একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায়-তার দিকে ইংগিত। দ্বিতীয়তঃ হাদীসের পাঠকদের নিয়তকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্ত বিশুদ্ধ করাও উদ্দেশ্য।

[এর মধ্যে ঐ সব ব্যক্তির উত্তর রয়েছে যারা ইমাম বুখারী (র)-এর সমালোচনা করেন স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সালাম-দরূদ, গ্রন্থের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত দীর্ঘ ভূমিকা না লেখার জন্যে। কারণ, ইমাম বুখারী যা সূচনায় এনেছেন তা-ই উত্তম ভূমিকা হওয়ার জন্য যথেষ্ট।]

ঈমান, সওয়াবের আশা ও হাদীসে নববীর মূল্যায়নের পাশাপাশি হাদীসের প্রতি যোগ্য আচরণ ও শিষ্টাচারও থাকতে হবে। আল্লাহ যে হাদীস পড়ার তাওফীক দিয়েছেন এ সৌভাগ্যের জন্য তাঁর বিনীত শুকরিয়াও জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। যারা এ মহান বিষয়ে দরস দিতেন তারা যারপরনেই এর প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ছাত্ররা হাদীস শরীফ পড়ার তাওফীক পেয়ে নিজেদেরকে মর্যাদাবান মনে করতেন। হাদীস শুরু করার আগে ভালভাবে ওযু করতেন, যথাযথ আদব বজায় রাখতেন এবং দরস চলাকালে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নীরব থাকতেন। অনরূপ যারা হাদীস শরীফের সাথে বে-আদবীমূলক আচরন করেছে, হাদীসের বই-পুস্তকের অবমাননা করেছে, অযথা সমালোচনা করেছে-তাদের সম্পর্কেও অনেক ভয়াবহ কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে, কীভাবে আল্লাহ্র গজব ও অসন্তুষ্টি তাদেরকে গ্রাস করেছে? অনেকে ঈমানহারা পর্যন্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানকে, বিশেষত দীনের তালিবে ইলমদেরকে এ ধরনের অশুভ পরিণাম থেকে হেফাজত করুন।

কুরআনুল কারীম থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, দুনিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রেরণের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কিতাবুল্লাহ ও হিকমত তথা প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া এবং পরিশুদ্ধ করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে ঃ

"যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয়, যা তোমরা কখনো জানতে না, (সূরা বাকারা ঃ ১৫১)

ইরশাদ হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন। বস্তুত ঃ তারা ছিলো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৬৫)

আরো বলা হয়েছে ঃ "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন, শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিলো ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।" (সূরা আল-জুমআহ ঃ২)

সুতরাং মানুষের আত্মাসমূহকে পরিশুদ্ধ করা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের অন্যতম লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং নবুয়তে মুহাম্মদী, ইসলামী শরীয়ত ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সার্বজনীন আদর্শের অন্যতম আকর্ষণীয় দৃশ্য। আর এটা বাস্তবায়িত হয়েছিলো চরিত্র সংশোধন, উত্তম গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা এবং গর্হিত ও দূষণীয় বিষয়াবলী হতে পরিত্রাণের মাধ্যমে। ফলে, নববী শিক্ষা-দীক্ষার এ পাদপীঠ থেকে বের হয়েছে মানবতার উৎকৃষ্ট নমুনা, অনুপম চরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শ এবং নবুয়তের আলোয় আলোকিত একদল সেরা মানুষ। এরা প্রত্যেকেই ছিল নবী (সা)-এর শিক্ষা ও আদর্শে উজ্জীবিত। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ বলেছেন, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।' (সূরা আল-আহযাব ঃ ২১)

আল্লাহ তাআলা 'হিকমত' শব্দটিকে এ ধরনের উন্নত চরিত্র, আদব ও শিষ্টাচারের অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। [এ প্রসঙ্গে সূরা লুকমানের ১২ আয়াত দ্রষ্টব্য।]

নিম্নোক্ত হাদীস শরীফেও এ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের (অর্থাৎ, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধন) গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

'আমি তো উত্তম চরিত্রাবলীকে পূর্ণতা দানের জন্যে প্রেরিত হয়েছি।' [মুআত্তা ইমাম মালিক রহ.। ইবনে আব্দিল বার রহ বলেন, হাদীসটি মুত্তাসাল এবং বেশ কয়েকটি সহীহ দিক দিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত। ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা) হতে সরাসরি বর্ণিত বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন, 'ইন্নামা বুয়িছতু লিউতাম্মিমা সা'লিহাল আখলাক্ব।]

রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন উন্নত চরিত্রাবলীর সর্বোত্তম নমুনা ও উৎকৃষ্ট আদর্শ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাঁর স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত আছেন' (সূরা আল-ক্বলম ঃ ৪)

অতএব, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত ও হাদীসের গ্রন্থাবলী হতে এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ, হাদীস পড়ে

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র সংশোধন এবং সুন্নাতে নববীর অনুকরণের চেষ্টা করতে হবে। হাদীসের বই-পুস্তকে পঠিত রাসূলুল্লাহর শিক্ষা ও শিষ্টাচারগুলোকে জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রয়াস চালাতে হবে। যারা হাদীস পড়বে তাদের আগ্রহ থাকতে হবে (হাদীসের শিক্ষক, গবেষক ও লেখক হওয়ার পরিবর্তে) আচার-আচরণ, লেন-দেন ও চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে আদর্শ হওয়ার। হাদীসের ছাত্র নিজের জীবন-যাপন, লেন-দেন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে নিজেই হাদীস শাস্ত্রের প্রভাবের জন্য দলীল হওয়ার প্রচেষ্টা করবে। তাকে দেখেই যেন মানুষ সুন্নাতে রাসূলের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। তাকে এমন হতে হবে যেন মানুষ তার অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য হয়, উদ্বুদ্ধ হয় ইসলামকে জানার জন্যে। অনুপ্রাণিত হয় সীরাতে নববী অধ্যয়নের প্রতি। ফলশ্রুতিতে তার জীবনটাই হয়ে যাবে উত্তম দাওয়াত, ইসলামের প্রচার-প্রসারের এক শক্তিশালী মাধ্যম।

তাই হাদীস শরীফ পড়তে গিয়ে এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক বই-পুস্তকের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ বিষয়ে লিখিত সহীহ বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে-হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুখারী শরীফের রচয়িতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রহ) কর্তৃক প্রণীত 'আল-আদাবুল মুফরাদ', দ্বিতীয়ত ঃ হাফিজ জকিয়ুদ্দীন আল-মুনযিরী (র) (৫৮১-৬৫৬ হি) কর্তৃক রচিত 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব', তৃতীয়ত ঃ মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু জাকারিয়া নব্বী (র) (৬৩১-৬৭৬ হি.) কর্তৃক রচিত 'রিয়াজুস সালেহীন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালীন' [এখানে বিনয়ের সাথে আল্লামা নদভী (র)-এর পিতা আল্লামা আব্দুল হাই হাসানী (র) (১৩৪১ হি.) কর্তৃক প্রণীত 'তাহযীল আখলাক্ব' নামক বইটিও সংযোজন করা যায়। বইটি আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত থেকে মুদ্রিত।]

অবশেষে বলবো, দীর্ঘকাল হতে প্রচলিত ফিকহী মাজহাবের ওপর আক্রমণ করা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকতে হবে। বিশেষ করে যে সব ইমাম একান্ত ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ফিকহী মাসআলা বের করে উম্মাহর আমলের সুবিধার্থে পেশ করেছেন, ফিকহী গবেষণা করার সময় সর্বাগ্রে কুরআন-হাদীসকেই আসল উৎস হিসেবে রেখেছেন এবং যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, তাঁদের প্রতি কটাক্ষ আচরণ ও নির্দয়তা পরিহার করতে হবে। মাজহাব নিয়ে অযথা ঘাঁটাঘাঁটি এবং এ নিয়ে সময় ব্যয় ও মেহনত করা উভয়ই অপচয়ের শামিল। এ ধরনের পরিশ্রমকে অপাত্রে জিহাদ এবং প্রকৃত দুশমন নয় এমন লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। [এ ক্ষেত্রে আল্লামা ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) রচিত

'আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' শীর্ষক গ্রন্থটির ভূমিকা দ্রষ্টব্য। উল্লেখ্য, এখানে হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত বিভিন্ন দলীল ও সহায়ক দলীল প্রমাণের আলোকে ফিকহী মাজহাব ও বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন প্রাচীন অনেক বড় বড় আলেম করেছেন। এখানে উদ্দেশ্য প্রচলিত বিভিন্ন ফিকহী মাজহাবের উপর অঞ্চল ও গোষ্ঠীভিত্তিক পরিচালিত ওসব আক্রমণ ও আবেগী আন্দোলন হতে বিরত থাকার আহ্বান করা, যার দ্বারা সাধারণত উম্মাহর কোন উপকার হয় না। বিশেষত এমন এক যুগে, যখন ইসলামের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে সর্বত্র এবং সমূহ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ইসলামী শরীয়ত।]

এক্ষেত্রে পরিশ্রম করার পরিবর্তে আল্লাহ কুরআন-হাদীস পড়া ও বুঝার যে সুযোগ দান করেছেন এবং যে বাকশক্তি, বাগ্মিতা ও প্রামাণ্য কথা বলার নেয়ামত দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ধন্য করেছেন, তা প্রয়োগ করা উচিত শিরকের মুকাবেলায়, সবচে' বেশি গুরুত্ব আরোপ করা দরকার শিরকের যাবতীয় প্রকার ও বিভিন্ন ধরনের বিদআত-কুসংস্কার অপনোদনের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে এমন দেশে যেখানে ইসলাম এসেছে অনারব বিজেতাদের মাধ্যমে, যে সব দেশ মুসলিম সংখ্যালঘু এবং গোটা দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিমদের আচরিত আক্বীদা-বিশ্বাস ও স্বভাব-প্রথার অনুকূলে শাসিত, যে দেশে (অনেক সময় দেখা যায়) দীর্ঘ যুগ থেকে হাদীস শরীফের পঠন-পাঠন ও প্রচার-প্রসার এবং পবিত্র কুরআনুল কারীম বুঝা-বুঝানোর প্রক্রিয়া ও কুরআনী শিক্ষা চালু হয়ে আছে স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মাধ্যমে-যেমন ভারত, সেখানে অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে শিরক-বিদআতের মূলোৎপাটনের চেষ্টা করা উচিত। এক্ষেত্রে ইমাম আহমদ ইবনে আব্দুর রহীম ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) ও তাঁর পুত্র, প্রপৌত্র ও খলীফাদের গৃহীত নীতি ও পথ অনুসরণীয়। আবার এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ (১২৪৬ হি.) (র) তাঁর সাথী ইমাম ইসমাইল শহীদ রহ. এবং আরো যাঁরা উভয়ের সঙ্গী-সাথী ছিলেন। যেমন– শায়খ বেলায়েত আলী সাদেকপুরী পাটনবী এবং তাঁর সাথী ও খলীফারা। অনুরূপ শায়খ কারামত আলী জৌনপুরী যাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও এর আশপাশের কয়েক মিলিয়ন মানুষ সহীহ আক্বীদার হিদায়েত পেয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাতের উপর আমলের পথ খুঁজে পেয়েছে। [এসব বিখ্যাত আলিমদের দাওয়াত ও সংগ্রামের ইতিহাস, বিশেষ করে তাঁদের ইমাম সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর সম্পর্কে জানার জন্যে আল্লামা নদভী রহ কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (উর্দু, বাংলা), 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান (বাংলা সংস্করণের নাম 'ঈমান যখন জাগলো') ও 'আল-ইমাম আল্লাযী লাম ইউফফা হাক্কুহু মিনাল ইনসাফ ওয়াল ই'তিরাফ' শীর্ষক

বইগুলো এবং আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (র) রচিত 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' নামক বইটি দ্রষ্টব্য। স্মর্তব্য, হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র)-এর হাতে চল্লিশ হাজার হিন্দু-মূর্তিপূজক ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। একইভাবে তাঁর হাতে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস, নষ্ট চরিত্র ও কুকর্ম ত্যাগ করে তাওবা করেছে তিন মিলিয়ন মুসলমান।-সংকলক ও অনুবাদক]

আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাওফীক দান করুক। আমীন।[১]

আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করছেন তাদেরকে বলছি

বর্তমান যুগে মুসলিম চিন্তাবিদ ও আলেম সমাজ নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। প্রথমত তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে এসব সমকালীন চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে যে, এক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামই পারে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে, দিতে পারে সঠিক দিক-নির্দেশনা, বাতলাতে পারে উত্তরণের পথ। অতঃপর আলেম সমাজ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের একান্ত করণীয় হচ্ছে, যে কোন দল, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা....সব কিছুর ওপর ইসলামকেই প্রাধান্য দিতে হবে। তারা যদি আসলেই ইসলামের স্থায়িত্ব চায়, তা হলে এর দাবি হচ্ছে, অন্য সব পরিচয় মুছে দিতে হবে। বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নামে বিচিত্র সাইনবোর্ড, বর্ণালী ব্যানার, পতাকা ও প্রতীক সব মুছে ফেলতে হবে। সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে ইসলামের স্বার্থে কাজ করতে হবে। ইসলামের স্বার্থেই সংগ্রাম চলবে। ইসলামই হতে হবে তাদের অভিষ্ট লক্ষ্য। চলার পথে এতটুকু দ্বিধা করা যাবে না। এক মুহূর্তের বাধাও বরদাশত করা হবে না। চালিয়ে যেতে হবে তাদেরকে এক বিরতিহীন দুর্বার সংগ্রাম।

অনুরূপ কাজ করতে গিয়ে সংগ্রামী বন্ধুদের সামনে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ আসবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে সংগঠন কিংবা দলীয় স্বার্থের ওপর দীন ও আক্বীদাগত স্বার্থকে সর্বদা অগ্রাধিকার দিতে হবে। দীন ও ঈমান এবং এতদু'ভয়ের বিজয়ই তাদের সামনে একমাত্র টার্গেট হিসেবে পরিষ্কার থাকতে হবে। কৃতিত্ব যারই হোক, আমাদের কিংবা অন্য কোন দীনী মু'মিন ভাইয়ের, আমাদের দলের নাকি অন্য দলের-তা বিবেচ্য নয়; ইসলামের বিজয় হোক, দীন ও ঈমানের জয় হোক, সর্বোপরি আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হোক... এ বাসনাই থাকা উচিত, আল্লাহর রাহে সংগ্রামরত প্রতিটি মুসলমানের।[২]

---

১. আল্লামা নদভী (র.) রচিত 'আল মাদখাল ইলা দিরাসাতিল হাদীস' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭-৭৮।

২. আল্লামা নদভী (রহ) কর্তৃক রচিত আরবী গ্রন্থসমূহের তালিকা হতে উৎকলিত।

মাদরাসা পড়ুয়াদেরকে বলছি

আমাদের মাদরাসাগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো ছিল, তারা দীনের অতন্দ্র প্রহরী তৈরি করবে, যারা দীনের সীমান্ত রক্ষায় আত্মনিবেদিত থাকবে, যাতে কোন চোর বা গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ না ঘটে। এখন তারাও যদি লবণের খনিতে পড়ে লবণ হয়ে যায় অর্থাৎ যেমন দেশ তেমন বেশ-এর দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কর্তব্য বিস্মৃত গড্ডালিকা প্রবাহের মত হয়ে যায় এবং শরীয়তসম্মত ও শরীয়তবর্জিত যে কোন গর্হিত কাজে সমর্থন দিতে শুরু করে, অধিকন্তু তারাই সে সবের নেতৃত্বে অবতীর্ণ হয়, তা হলে আর আশা-ভরসা কোথায়? কবির ভাষায় ঃ

'কাবার থেকেই যদি জন্ম হয় কুফরীর,

মুসলমানী রইবে তখন কোথা? জাতির রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায়।

তা হলে সে জাতির অবলুপ্তি আর কতদিনের ব্যাপার!

আরবী ভাষা শেখার বদৌলতে প্রাপ্ত চাকুরীই যদি মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে আরবী আর ইংরেজীর মাঝে ব্যবধান কী রইল? আলেমগণ 'ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া' খেতাবে ভূষিত। নবীগণ ছিলেন দীনের ব্যাপারে অতিশয় মর্যাদাবোধসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ। ইহুদীরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের খিদমতে আবদার করল, 'ইজআল লানা ইলাহান কামা লাহুম আলিহাহ্' অর্থাৎ 'আমাদের জন্য এমন কোন প্রকার জৌলুসপূর্ণ মাবূদ (প্রতিমা) বানিয়ে দিন, যেমন রয়েছে ঐ (মিসরীয় কিবতী) লোকদের।' তিনি তখন নবীসুলভ তেজস্বিতার সাথে বজ্রগম্ভীর জবাব দিয়েছিলেন, "তোমরা তো চরম গণ্ডমূর্খের দল। (আরে) এরা যাতে (লিপ্ত) রয়েছে, তাতো ধ্বংসোন্মুখ। আর তারা যা কিছু করে, তা তো বাতিল ও ভণ্ডুল।" [সূরা আরা'ফ ঃ ১৩৭-১৩৮]

বিশ্বনবীর রিসালাত যুগে এক সফরের সময় হুবহু এমনই মর্যাদাপূর্ণ ও অনুকরণশীল মনোভাবপ্রসূত একটি ঘটনা ঘটেছিল। আরবের কোন কোন গোত্রের 'যাত আনওয়াত' নামে সজীব পল্লবীতে গাছের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। তারা সে গাছে অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত, তার তলায় নৈবেদ্য পেশ করত, বলি দিত এবং সেখানে একদিন অবস্থান করত। গাযওয়া-ই হুনায়ন (হুনায়ন যুদ্ধ)-এর সময় গাছতলার ঐ দৃশ্য দেখে কিছু নতুন মুসলমান (যাদের অন্তরে তখনও ঈমান সুদৃঢ় হয়নি) বলে ফেলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য মনের ভক্তি প্রকাশ এবং অর্ঘ্য নিবেদনের একটি ক্ষেত্র ও কেন্দ্র নির্ধারণ করে দিন, যেমন এসব গোত্রের রয়েছে। তাদের এ প্রস্তাব হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবীসুলভ গায়রাত ও মর্যাদাবোধে কম্পন সৃষ্টি করল। তিনি বজ্রগম্ভীর জবাব দিলেন, "তোমরা তো

হযরত মূসা-এর কওমের অনুরূপ ঘটনা ঘটালে। অবশ্যই বুঝা যায়, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রতিটি পদক্ষেপ ও পদ্ধতির হুবহু অনুকরণ করবে।"

আলেমদের হতে হবে অনুরূপ তেজ ও গাম্ভীর্যতাসম্পন্ন এবং তাওহীদ ও সুন্নত বিষয়ে মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আমাদের দীনী আরবী মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এ ধরনের ইস্পাতদৃঢ় তেজস্বী মনোভাবসম্পন্ন ও মর্যাদাবোধসমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যেই। চিরদিন এ বৈশিষ্ট্য স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন রাখা এ প্রতিষ্ঠানসমূহের পবিত্র আমানত ও কর্তব্য।[১]

যারা সফল সুনাগরিক হতে চায় তাদেরকে বলছি ঃ

মনে রাখবেন, আমরা যদি দেশের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখি এবং তাতে প্রবাহিত অনুকূল-প্রতিকূল ও উষ্ণ-শীতল বায়ুর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকি, আমরা যদি উষ্ণতা ও আর্দ্রতামুক্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থানের কল্পনা বিলাসে গা ভাসিয়ে দিই এবং তাতে জীবনকে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে মনে করতে শুরু করি, তা হলে মনে রাখবেন, আমরা নিজেরাই নিজেদের অকল্যাণ ডেকে আনব। নিজেদেরই ঘটবে আত্মাহুতি, সাথে সাথে দীনেরও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে। কেননা, কোন দল উপদল কিংবা দেশের বাসিন্দাদের একটি অংশ অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না।

তবে বৃহত্তর জীবনধারার সাথে সংযোগ রক্ষা অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ এবং তার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমানা ও চৌহদ্দি। আমি বলছি না, আপনারা তরলীভূত হয়ে আপনাদের সত্তা বিলীন করে দিন; বরং আপনারা অবিচল থাকুন আপনাদের পয়গাম ও বিশ্বজনীন দাওয়াত প্রচারে। আপনারা টিকে থাকুন আপনাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আপনারা পূর্ণমাত্রায় ধরে রাখুন আপনাদের ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বর্জনেও আপনারা কঠিনভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করুন; কিন্তু বৃহত্তর জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন না। আমি 'জাতীয় জীবন' স্রোতের কথা বলছি না। আল্লাহ না করুন, জাতীয় স্রোতধারায় বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা যেন কোনোদিনই আমার মুখ থেকে না বেরোয়। একবারও না। আমি বলছি, আপনারা 'জীবন স্রোত' থেকে হারিয়ে যাবেন না। কারণ জীবনের গতিধারা থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়, তারা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

জীবনধারীদের মাঝে তার বলে অধিকৃত কোন স্থান থাকে না। ইসলামকে আমি এত সংকীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ ও অপূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস করতে পারি না যে, পরিস্থিতি ও

১. আল্লামা নদভী রহ এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭।

জীবনের বাস্তবতার দিকে মনোযোগ দিলেই ফরয-ওয়াজিব অনাদায়ী থেকে যাবে, 'আকিদা ও মৌলিক আদর্শ' বিশ্বাসে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। আমাদের বুযুর্গ পূর্বসূরীগণ শাহানশাহী পরিচালনা করেছেন, সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের জাহাজুদে পর্যন্ত অনিয়ম দেখা দেয়নি। কোন সাধারণ ক্ষুদ্র সুন্নতও বর্জন করতে হয়নি। হযরত সালমান ফারেসী (রা) এর ঘটনা শুনুন, তিনি তখন ইরাকের রাজধানী মাদায়েনে অবস্থান করছেন। একদিন খাবার কালে খাদ্যের কিছু অংশ মাটিতে পড়ে গেলে তিনি তা সযত্নে তুলে নিয়ে পরিচ্ছন্ন করে খেয়ে ফেললেন। কেউ বলে উঠল, আরে, আপনি গভর্নর হয়েও এমন করছেন! এতে যে ইজ্জত যায়! তিনি কী জবাব দিয়ে ছিলেন? তিনি বললেন, তোমাদের মত আহমক নির্বোধদের খাতিরে আমি আমার প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নত ছেড়ে দেব?

ব্যাপার এমন নয় যে, আগুনের উপস্থিতিতে পানি থাকতে পারবে না আর পানি এসে গেলে আগুন নিভে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অবিচলতা, তাকওয়া, নীতি ও অধিক ইবাদতের মাধ্যমেই একজন মানুষ সফল ও সুনাগরিক হতে পারে। আমি তো মনে করি, যারা বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং নীতি ও কর্তব্যে নিয়মানুবর্তী হয়, তারাই হতে পারে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর নাগরিক।[১]

পৃথিবীর নামে আকাশের হাদিয়া

আল্লাহ্ তায়ালা আরব জাতিকে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলামের পয়গাম বহনের জন্য নির্বাচন করেছেন। আরবদের মধ্যে এমন কিছু প্রাকৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যদের মাঝে অনুপস্থিত। যেমন আল্লাহ্ তাআলা আগেকার যুগের বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি জেনে-শুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে নির্বাচন করেছিলাম। (সূরা আদ-দুখান ঃ ৩২)

অনুরূপ আল্লাহ্ পাক আরব জাতি ও ইসলামের মাঝে এক চিরন্তন সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছেন। উভয়ের মধ্যে একের পরিণতি অন্যের সাথে বেঁধে দিয়েছেন। ফলে আরবদের কোন সম্মান থাকলে তা একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই। একইভাবে ইসলামের সঠিক প্রকাশ তখনই হবে যখন আরবরা নেতৃত্ব দিবে ইসলামের কাফেলার, বহন করবে ইসলামের আলোক মশাল। এ নির্মল মৈত্রীর ব্যতিক্রম ঘটে না সাধারণত। ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ঘটলেও তার পেছনে থাকে ব্যক্তি বিশেষ বা ঘটনা বিশেষ। তা-ও এই মহিয়ান জাতির কল্যাণে, তাদের সুবাদে। কিন্তু জাতির জীবনচালিকা শক্তি ইসলামই। ইসলামের মাধ্যমে এবং ইসলামের কারণেই তাদের জীবন চলা। ইসলাম ও আরব, উভয়ের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উভয়ে মিশে গেছে এক মোহনায়।

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৬-৯৭।

আরবরাই হলো সর্বশেষ সত্য নবীর 'হাওয়ারী' বা একান্ত অনুগামী। আজ আরবরা তেলের মালিক। এটা পৃথিবীর প্রতি পৃথিবীর হাদিয়া ও উপঢৌকন। অথচ তারা নিঃসন্দেহে এর চেয়ে বেশি মূল্যবান, এর চেয়ে বেশি সম্মানজনক ও মহান সম্পদের মালিক। আর তা হচ্ছে ঈমান। নিশ্চয়ই ঈমানের সম্পদ সবচেয়ে বড় হাদিয়া। এ হাদিয়া আকাশের পক্ষ থেকে পৃথিবীর প্রতি দুনিয়াবাসীর নামে।

এ জন্যেই আমি আরবদেরকে ভালবাসি, আরব জাতিকে মহব্বত করি। আমার এ ভালবাসা কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের আলোকে নয়, কিংবা ক্ষয়িষ্ণু কোন বংশীয় কারণেও নয়; আমার ভালবাসা সেই দ্যুতিময় আলোকবর্তিকা হতে উৎসরিত, যা আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিশেষভাবে দান করেছেন। তাদের ভূখণ্ড ও তাঁদের ভাষাকেই তো আল্লাহ পাক সর্বশেষ রিসালত ও আসমানী কিতাব নাযিলের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। সুতরাং তাদেরকে নতুনভাবে সেই আলোর দিগন্তে উন্নীত হতেই হবে। নিজেদের পরিবর্তে তাদেরকে ভাবতে হবে সারা বিশ্ব নিয়ে।

ইসলামের প্রখ্যাত কবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল সত্যি বলেছেন, আকাশের তারকারাজি যদি আমাদের অনুগত হয়ে যায়, গ্রহ-নক্ষত্ররা যদি আমাদের সামনে নিজেদের সঁপে দেয়, তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, আমাদের আত্মা যে জুড়িয়ে আছে সৃষ্টির সর্দার সেই মহান সত্তার পাদুকাদানের সাথে, যার তারকা কখনো অস্ত যায় না, যার আলো কখনো নিভে না, হয় না কভু নিষ্প্রভ তাঁর পরশে চমকিত সৌভাগ্য। তিনি যে নবীকূল শিরোমনি, রাসূলদের ইমাম, সঠিক পথের অভিজ্ঞ রাহী; যাঁর চরণধূলায় ধন্য কালো মৃত্তিকা আজ ভাগ্যবানদের চোখের সুরমায় পরিণত। আরবদের জন্য এর চেয়ে মূল্যবান ও মর্যাদার বিষয় আর কিছু হতে পারে কি?[১]

হে আরব তরুণ! স্পষ্ট ভাষায় শুনে নাও, ইসলামের মাধ্যমেই আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানিত করেছেন

গোটা আরব জাতি যদি একটি প্ল্যাটফরমে একত্রিত হয়, আর আমাকে যদি তাদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ দেয়া হয়; এমন কিছু কথা, যা তারা কান দিয়ে শুনবে, হৃদয়ঙ্গম করে নিবে–তাহলে আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাদেরকে বলবো, হে সুধী সমাবেশ! নিশ্চয় ইসলামই আপনাদের জীবনের উৎস, যা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ আরবী (সা)। ইসলামের দিগন্ত হতেই উদিত আপনাদের সুবহে সাদিক। মনে রাখবেন, আপনাদের বিশ্বজোড়া

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া ঃ ৯-১৫ জুল জা'দা ১৪১৭ হিজরী সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

খ্যাতি ও মর্যাদা... সব কিছুর মূল উৎস ও কারণ হচ্ছে নবী কারীম (সা)। শুধু আপনাদের নয়; দুনিয়া জুড়ে যে সব কল্যাণ আজ বিরাজিত সবই তাঁর পথ দিয়ে, তাঁর বরকতময় হাতের ছোঁয়ায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা ফায়সালা করেছেন, আপনাদের মান-মর্যাদার মিনার রচিত হবে একমাত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক জুড়েই, তাঁর পথ অনুসরণের মাধ্যমে এবং তাঁর রিসালতের ভাগ্যবান বাহক হয়েই; অন্য কোন পথে নয়। তাঁর আনীত দীনের রাস্তায় সব কিছু বিসর্জন দিয়েই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন আপনারা। আল্লাহর এ ফায়সালার ব্যত্যয় হবার অবকাশ নেই, আল্লাহর অমীয় বাণী পরিবর্তনের কোনই সুযোগ নেই।

নিঃসন্দেহে আরব বিশ্ব ছিলো পানিবিহীন নিঃস্ফল এক সমুদ্রের মতো। কিন্তু যখন তার বুকে জন্ম নিলেন মুহাম্মদ (সা) তখন তার ভাগ্য খুলে যায়। তিনি (সা) আবির্ভূত হলেন তাঁর সংগ্রামী জীবন নিয়ে, সবার ইমাম হয়ে কাঁধে তুলে নিলেন নেতৃত্বের ভার। অতঃপর আরব জগত ইসলামের পয়গাম নিয়ে জেগে উঠলো, যেমন প্রথম যুগে জেগেছিলো গোটা আরব। শুধু তাই নয়, মজলুম বিশ্বকে মুক্তি দিলো ইউরোপীয় উম্মাদদের কব্জা থেকে, যারা ছিলো সভ্যতাকে কবর দিতে বদ্ধপরিকর, যারা নিজেদের দম্ভ ও অন্যায় অহমিকা দিয়ে মানবতাকে নির্মমভাবে হত্যা করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসারী আরবরাই বিশ্বকে বাঁচালেন পতনের হাত থেকে, পথ দেখালেন উন্নতি ও অগ্রগতির। ধ্বংস, বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করে দিক-নির্দেশনা দিলেন প্রগতি, শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তার। আহ্বান করলেন কুফর ও সীমালঙ্ঘন থেকে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে। সত্যের এ দাওয়াত, শান্তি ও প্রগতির এ আহ্বান, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার এ দিক-নির্দেশনা আরব বিশ্বের একান্ত দায়িত্ব। আর নিশ্চয় এ দায়িত্ব সম্পর্কে আপন রবের নিকট শীঘ্রই জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, তখন কী জবাব দিবে, এ নিয়ে এখনই তাদের চিন্তা করা উচিত।[১]

আরব যুবকদের ত্যাগ-বিসর্জনই মানব-সৌভাগ্যের সেতু-বন্ধন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন মানবতার দুর্ভাগ্য চরম সীমায় উপনীত। ভাগ্যাহত মানবতার জন্যে কাজ করা বিলাসপ্রিয় কিছু মানুষের পক্ষে কোনদিন সম্ভব ছিল না। জীবনে যারা কোন ঝুঁকি নিতে পারে না, লোকসান সহ্য করতে পারে না, যারা ভয়াবহ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে ভয় পায়, তারা মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে পারে না। এ কাজ বড়ই মহান। যে কারো দ্বারা হয় না। মানবতার বিষয়ে কাজ করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক দল সাহসী লোকের, যারা

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত 'আল আরব ওয়াল ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯।

মানবতার সেবায় সব কিছু লুটিয়ে দেবে, নিজেদের সব সম্ভাবনা কুরবানি করে দেবে, যারা নিজেদের পবিত্র পয়গাম আদায়ের স্বার্থে চুরমার করে দেবে রঙিন ভবিষ্যত। মানবতার মহান কাজ তারাই করতে পারে যারা নিজেদের জান-মাল, জীবনোপকরণ এবং দুনিয়ার সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে, অনিশ্চয়তার সম্মুখীন করতে পারে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রয়োজনে ধ্বংসের মুখোমুখি করতে পারে আপন পেশা ও জীবনের সকল অর্জন। এমনকি তাদের নিয়ে লালিত আপনজন, পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধবের স্বপ্নগুলো পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিতে প্রস্তুত এ মহান দায়িত্ব পালনে। ঠিক যেমন হযরত সালেহ (আ)-কে তাঁর আপনজন, বন্ধু-বান্ধবরা বলেছিলো। পবিত্র কুরআনে তাদের সেই কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ 'তারা বলল– হে সালেহ! ইতোপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল।' (সূরা হুদ ঃ ৬২)

যে কোন মহান দাওয়াতী কার্যক্রমে প্রাণ সৃষ্টির জন্যে এবং মানবতার অস্তিত্বের জন্যে আপোষহীন সংগ্রামী মুজাহিদদের বিকল্প নেই। পার্থিব জীবনে কিছু মানুষের দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে (সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে; আসলে তারা দুর্ভাগা নয়) গোটা মানবতা এবং জাতির পরে জাতি সৌভাগ্য লাভ করে। এদের ত্যাগের ফলে বিশ্বের ধারা পালটে যায়, বিশ্ব পরিচালিত হয় অকল্যাণ হতে কল্যাণের দিকে। প্রকৃতই যদি কিছু মানুষের দুর্ভাগ্যের বিনিময়ে কয়েকটি জাতি সৌভাগ্য অর্জন করে তা হলে তা কতই না সৌভাগ্য! অল্প কিছু লোকের সামান্য সম্পদ যদি বিনষ্ট হয়, কিছু ব্যবসা মন্দা কবলিত হয়; আর বিনিময়ে যদি অসংখ্য মানুষ জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়, অগণিত আত্মা যদি আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তা কতই না সৌভাগ্যের বিষয়!

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাবের সময় আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চিত জানতেন যে, তৎকালীন রোমক, পারসিক এবং আরো যারা তথাকথিত সভ্য পৃথিবীর বাগডোর হাতে নিয়ে কর্তৃত্ব চালাচ্ছিলো, তারা কেউ-ই তাদের বিলাসিত কৃত্রিম জীবন প্রণালী দিয়ে মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে ঝুঁকি নিতে পারবে না। দাওয়াত, জিহাদ ও দুস্থ মানবতার সেবায় কষ্ট সহ্য করার যোগ্যতা তাদের নেই। প্রয়োজনীয় বস্তু তো দূরের কথা, পানাহারের সামান্য চাকচিক্যও তারা বিসর্জন দিতে পারবে না। তাদের চিরায়ত ভোগ-বিলাসের যৎসামান্য অংশ থেকেও সরে আসতে তারা সক্ষম নয়। মহান আল্লাহ্ অবগত ছিলেন যে, তখনকার সময়ে কিছু লোকও এমন ছিলো না যারা স্বীয় প্রবৃত্তিকে কঠোর হাতে দমন করতে পারে, ক্রোধ-জিঘাংসাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং ত্যাগ করতে পারে দুনিয়ার লোভ-লালসা। তখন তিনি ইসলামের পয়গাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যের জন্যে এমন একটি জাতিকে নির্বাচন করলেন যারা দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব সাহসিকতার সাথে

কাঁধে তুলে নিবে, যারা বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজনে সব কিছু কুরবান করে দিবে, নিজের ওপর অপরকে অগ্রাধিকার দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর এ নির্বাচিতরাই হলো সেই শক্তিশালী আরব জাতি, যাদেরকে তখনও কোন কথিত সভ্যতা গ্রাস করেনি। সেদিক দিয়ে তারা ছিলো নিরাপদ। তাদেরকে তখনও বিলাসিতা আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তারাই পরে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রিয় সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাদের অন্তর ছিলো সবচে' পূণ্যময়, তাঁদের জ্ঞান ছিলো সবার চেয়ে গভীরতম এবং তারা খুব কমই লৌকিকতা দেখাতেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) এ মহান দাওয়াত কায়েম করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট যা যা করণীয় সব কিছুই আদায় করলেন; দাওয়াতের পথে সংগ্রাম করলেন, পথিমধ্যে কোন কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ালে সব কিছুর ওপর দাওয়াতকেই অগ্রাধিকার দিলেন, দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং প্রবৃত্তির চাহিদার প্রতি বিমুখিতা প্রদর্শন করলেন। সত্যের এ দাওয়াত ও আহ্বানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন সারা বিশ্বের ইমাম এবং আদর্শ। একদা কুরায়েশের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সাথে আপোষ করার সুরে আলাপ করলো। যুবসমাজের জন্যে লোভনীয় এবং লোভীদের জন্য মুখরোচক সবকিছুই প্রস্তাবে পেশ করলো। নেতৃত্ব, যশ-খ্যাতি, অঢেল সম্পদ, সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ ইত্যাদি একে একে সবই প্রস্তাব করলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব কিছুই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করলেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাও আপোষ-রফার কথা বললেন এবং চেষ্টা করলেন তাঁর দাওয়াতী তৎপরতা একটু কমিয়ে আনতে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'হে আমার চাচা! আল্লাহ্র কসম, তারা যদি দাওয়াতের এ মহান কাজ বর্জন করার শর্তে আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্রও এনে রাখে, তারপরও আমি এ কাজ ছাড়বো না। হয়ত আল্লাহ্ তাআলা এ দাওয়াতকে বিজয়ী করবেন, অন্যথা এ দাওয়াতের পথে আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনাচার পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, জিহাদ, সংগ্রাম, অপরকে অগ্রাধিকার দান, দুনিয়াবিমুখিতা, সাধামাঠা জীবনযাপন এবং জীবনোপকরণাদি হতে যথাসম্ভব অল্পের উপর সন্তুষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা) শুধু তাঁর সমসাময়িকদের আদর্শ ছিলেন তাই নয়; বরং পরবর্তীদের জন্যেও ছিলেন উত্তম নমুনা। নিজের ভোগের জন্যে সমস্ত দুয়ার তিনি রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সামনের সকল পথ তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ত্যাগ-তিতিক্ষার এ প্রবণতা তাঁর পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছিলো। ফলশ্রুতিতে জনগণের মধ্যে তারাই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বেশি নিকটতম ও আপন ছিলেন যারা দুনিয়ার সবচে' কম অংশীদার হতেন, পক্ষান্তরে তারা জিহাদ ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে ছিলেন তুলনামূলক বেশি অগ্রগামী। কোন কিছু নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি

তাঁর আত্মীয় ও পরিবারের সদস্যদের দিয়ে তা আরম্ভ করতেন। কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা কিংবা লাভের কোন দ্বার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন। অনেক সময় তা নিষিদ্ধও করতেন নিজের নিকটাত্মীয়দের জন্যে। যখন সুদ নিষিদ্ধের ঘোষণা করার ইচ্ছা করলেন, শুরু করলেন আপন চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ দিয়ে। সবটুকুই রহিত করে দিলেন। জাহেলী যুগের রক্তের দাবি রহিতকরণের যখন ইচ্ছা করলেন, তখন আরম্ভ করলেন রবীআ ইবনুল হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি দিয়ে। এ দাবি তিনি অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। যাকাতের বিধি প্রবর্তন করলেন। এ বিধি নিশ্চয়ই কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে একটি অতি মহান আর্থিক উপকারিতা। কিন্তু এ উপকারিতা তিনি আপন আত্মীয়-স্বজন বনী হাশেমের ওপর চিরদিনের জন্যে হারাম বলে ঘোষণা করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) বনী হাশেমের জন্যে হাজীদের পানি পান করানোর পাশাপাশি কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও এক সাথে দেয়ার অনুরোধ করলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাতে রাজি হলেন না; বরং উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে কা'বা শরীফের চাবি বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এটা তোমার প্রাপ্য চাবি, হে উসমান! আজ কল্যাণ ও বিশ্বস্ততার দিন। আরো বললেন, এ চাবির দায়িত্ব চিরদিনের জন্যে তোমরা গ্রহণ করো। সব সময় তা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। একমাত্র জালিম ব্যক্তিই তোমাদের কাছ থেকে এ চাবি কেড়ে নিতে পারে।' এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) আপন সহধর্মিনীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন দুনিয়াবিমুখিতা, অল্পে তুষ্টি ও সাধাসিদে জীবন যাপনের প্রতি। তাঁদেরকে তিনি এ বলে সুযোগ দিয়েছিলেন যে, চাইলে তোমরা আমার সাথে এ কষ্টকর ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন অতিবাহিত করতে পারো, না হয় আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুখ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবনও নির্বাচন করতে পারো। এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত তাদের সামনে পাঠ করলেন, 'হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দিই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে আল্লাহ্ মহা পুরকার প্রস্তুত করে রেখেছেন।' (সূরা আল-আহযাব ঃ ২৮-২৯)

দেখা গেলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকেই নির্বাচন করেছিলেন। নবী কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হাতে যাঁতাকল টানতে টানতে ছালা পড়ে গিয়েছিলো। পিতার নিকট এসে অনুযোগ করলেন। সহযোগিতার জন্যে একটি দাসের অনুরোধ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সম্প্রতি দাস এসেছে শুনেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু পিতা 'সুবহানাল্লাহ,' 'আলহামদুলিল্লাহ'

ও 'আল্লাহু আকবার' পড়ার জন্য তাগিদ দিলেন। বললেন, 'খাদেমের চেয়ে এ আমলই তার জন্যে বেশি উত্তম।' এ ছিলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবহার তাঁর আপনজন, পরিবার-পরিজন ও কাছের লোকদের সাথে। যে যত কাছের তার সাথে তত কঠোর ও রুক্ষ হতো তাঁর এ আচরণ।

মক্কী জীবনে কুরাইশের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনলো। দেখা গেলো, তারপর থেকে তাদের আর্থিক অবস্থা বিরূপ হয়ে গেলো। তাদের জীবনে নেমে এলো অভাব-অনটন। ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হয়ে গেলো। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অনেককে জীবনের কষ্টার্জিত মূল সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হলো। অনেকে চিরায়ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন থেকে বঞ্চিত হলো। যারা এক সময় পোশাক-পরিচ্ছদে প্রবাদ পুরুষ ছিলেন তারা হয়ে গেলেন বেশ-ভূষায় পথের ফকীরের মত। কারো কারো ব্যবসা কারবার বন্ধ হয়ে গেলো দাওয়াতের কাজে অংশ নেয়ার কারণে এবং কাস্টমার ছুটে যাওয়ার কারণে। আবার অনেককে পৈত্রিক সম্পদ থেকেও বঞ্চিত করা হলো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা হিজরত করলেন, দলে দলে আনসাররা তাঁর অনুসরণ করলেন। ফলে তাদের বাগান ও কৃষিখামারের কাজে ব্যাঘাত ঘটলো। তারা যখন দিনের কিছু সময় কৃষিকাজের প্রতি মনযোগ দিতে চাইলেন, খেত-খামার ঠিক করার আগ্রহ দেখালেন, তাদেরকে সেই অনুমতি দেয়া হলো না। বরং ঈমানের কাজ বাদ দিয়ে এ সব করাকে আত্মঘাতি বলে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন। কুরআনের ভাষায় বললেন, 'আর তোমরা ব্যয় করো আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।' (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫)

পরবর্তী আরব এবং বিশেষত তাদের মধ্যে যারা ইসলামের এ দাওয়াতকে বরণ করে নিয়েছিলেন তাদের অবস্থা এমনই ছিলো। পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির তুলনায় আরবরাই সব চেয়ে বেশি জিহাদের কষ্ট স্বীকার করেছেন, জান-মালের ক্ষতি বরদাশত করেছেন দীনের স্বার্থে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেছেন এভাবে- 'বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান, যাকে তোমরা পছন্দ করো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (সূরা আত-তাওবা ঃ ২৪)

তিনি আরো এরশাদ করেছেন ঃ 'মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা।' (সূরা আত-তাওবা ঃ ১২০)

কারণ, মানবতার সৌভাগ্য তাদের ওপরই নির্ভর করে যারা ত্যাগ-বিসর্জন স্বীকার করতে পারে, যারা সহ্য করতে পারে ক্ষতি ও সমূহ দুর্বিপাক। সুতরাং আল্লাহ পাক বলেন, 'এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৫)।

তিনি আরো বলেছেন, 'মানুষ কি মনে করে, তারা এ কথা বলেই অব্যহতি পেয়ে যাবে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' অথচ তাদেকে পরীক্ষা করা হবে না।' (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ২)

তাই মহান এ গুরুদায়িত্ব থেকে আরবদের সরে থাকা এবং এক্ষেত্রে ইতিউতি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এতে মানবতার দুর্ভাগ্য আরো দীর্ঘায়িত হবে, বিশ্বের দূরবস্থা আরো স্থায়িত্ব লাভ করবে। আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো, তা হলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।' (সূরা আল-আনফাল ঃ ৭৩)

উল্লেখ্য, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্ব এক যুগসন্ধিক্ষণে অবস্থান করছিলো। অবস্থা ছিলো এরকম, হয়ত আরবরা অগ্রসর হয়ে নিজেদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি এবং প্রিয় সবকিছুকে ঝুঁকির সম্মুখীন করবে, দুনিয়ার লোভ-লালসার প্রতি বিমুখিতা প্রদর্শন করবে, সামাজিক বৃহত্তর স্বার্থে আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করবে এবং এর বিনিময়ে পৃথিবীতে সৌভাগ্য লাভ করবে, মানবতা সঠিক পথে পরিচালিত হবে, জান্নাতের বাজার কায়েম হবে, ঈমানের ব্যবসা চাঙা হবে। অথবা তারা পৃথিবীর কল্যাণ ও মানবতার সৌভাগ্যের ওপর নিজেদের জাগতিক লোভ-লালসা, প্রবৃত্তিকে অগ্রাধিকার দিবে, সামাজিক স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে। আর এতে দুর্ভাগ্য ও গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত থাকবে পৃথিবী অন্তহীনভাবে। কিন্তু আল্লাহ মানবতার কল্যাণ করতে চাইলেন। আরব জাতিকে এর জন্য নির্বাচন করলেন। ফলে আরব জাতি অনুপ্রাণিত হলো। তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব হলো। তিনি তাদের নিথর সমাজে ঈমান ও ত্যাগের রূহ ফুঁকে দিলেন, পরকাল ও পরকালের পূণ্যার্জনকে তাদের নিকট প্রিয়তর করে তুললেন। আরবরা আলোড়িত হলো পুরো মাত্রায়। তারা গোটা মানবতার কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলেন। মানুষের সৌভাগ্য নিশ্চিত করতে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের প্রত্যাশায় ত্যাগ করলেন দুনিয়ার মোহ। জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করলেন। মানুষের স্বভাবজাত লোভ-লালসা, স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা.... সবই তারা কুরবান করে দিয়েছিলেন। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও সংগ্রাম একান্ত আল্লাহর জন্যেই ছিলো নিবেদিত। তাই আল্লাহও

তাদেরকে ইহ-পরকাল উভয় জগতে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।

কালের চক্রবালে রাসূলুল্লাহর আবির্ভাবের সময়টির আবার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। পৃথিবী আরেকবার যুগ সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত। সময় এসেছে আবার রাসূলের স্বজাতি আরবদের অগ্রসর হবার। হয়ত তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে, জান-মাল সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে দুঃসাহসিক অভিযানে অংশ নিবে, প্রয়োজনে ঝুঁকির সম্মুখীন করে দেবে তাদের ভোগের সামগ্রী ও যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্যের উপকরণ, বিসর্জন দেবে জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা আর বিনিময়ে জেগে উঠবে পৃথিবী। এ ভূ-পৃষ্ঠ পরিগ্রহ করবে ভিন্নরূপ; যেখানে থাকবে না জুলুম-নির্যাতন, থাকবে না অনাচার-অবিচার। পক্ষান্তরে তারা যদি বর্তমান উচ্চাভিলাষ ও লালসার জগতে বাস করতে থাকে, পদ-পদবি ও চাকরীর গ্রেড উন্নয়নে ব্যস্ত থাকে, সব সময় আমদানী-রপ্তানী ও রাজস্ব বাড়ানোর ফিকিরে লেগে থাকে এবং এ ভাবনায় শুধু নিমগ্ন থাকে যে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা করা যায়? ঐশ্বর্য ও সম্পদের পাহাড় গড়া যায়। অঢেল সম্পদ ব্যয় করে বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করা যায় এবং অবাধে তা ভোগ করা যায়। যদি বর্তমান আরবদের অবস্থা তা-ই হয়, তাহলে পৃথিবী ধ্বংসের যে অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল যুগ যুগ ধরে, তাতেই নিপতিত থেকে যাবে হয়ত অনন্তকাল। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, আরববিশ্বের কাঙ্খিত যুবসমাজ যতদিন প্রবৃত্তির মদমত্ততায় নিয়োজিত থাকবে, যতদিন তাদের চিন্তা-ফিকির উদর-পূজা ও বস্তুবাদের চৌহদ্দির ভিতরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং এতদুয়ের সংগ্রামের নেশা থেকে মুক্ত হতে পারবে না, পৃথিবী ততদিন সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। অথচ জাহেলী যুগের কোন কোন জাতির যুবকরা নিজেদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের স্বার্থে সব কিছু বিসর্জন করে দিতে প্রস্তুত ছিলো। তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মানসিকতা ছিলো বর্তমান আরব যুবকদের চেয়েও প্রচণ্ড এবং এ নিয়ে তাদের চিন্তা-চেতনার পরিধিও ছিলো তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত। জাহেলী কবি ইমরুল কায়েসের সাহসও ছিলো অপেক্ষাকৃত উন্নত। নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় থেকে তা-ই প্রতিভাত হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ

'আমি যদি তুচ্ছ জীবিকার জন্য সংগ্রাম করতাম
তবে আমার জন্য তা যথেষ্ট ছিলো;
অথচ সামান্য ঐশ্বর্য চাইনি আমি,
আমি তো সংগ্রাম করি এক স্থায়ী মর্যাদার প্রত্যাশায়
আর আমার মতো কেউ স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে খুব কমই।

মোটের ওপর নিঃসন্দেহে বলা যায়, যৌবন ও তারুণ্যদীপ্ত এক দল মুসলমানের পরিবেশিত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের সেতু পেরিয়েই আজকের পৃথিবী সৌভাগ্যের রাজ তোরণে পৌঁছুতে পারে। মাটির উর্বরতার জন্যে নিশ্চয়ই সারের প্রয়োজন হয়। আর মানবতা নামক মাটি যে সারের দ্বারা উর্বরতা লাভ করবে এবং যার মাধ্যমে ইসলামের মূল্যবান ফসল উৎপাদিত হবে, তা হচ্ছে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি... যা সারের মত মানবতার ক্ষেতে মিশিয়ে কুরবান করে দিতে পারে আরব যুবকরা। ইসলামের বিজয়ের জন্যে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের জন্যে, সর্বোপরি অসংখ্য মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করতে তাদেরকে এ কুরবানী দিতেই হবে, এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। কারণ, এ যে মহামূল্যবান পণ্যের সামান্যতম বিনিময়।[১]

মুসলিম উম্মাহ এবং উম্মাহর নেতৃত্বে যারা আছেন তাদেরকে বলছি

আপনারা কি পারবেন মুসলিম উম্মাহ এবং উম্মাহর নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের জন্যে একটি নসীহত বহন করতে? তাহলে শুনুন...

আমার মনে হয়, শুধু মুসলিম বিশ্ব নয়; গোটা মানব বিশ্বই আজ যুগ সন্ধিক্ষণে এসে অবস্থিত। আজ আমরা এমন চূড়ান্ত সময়ে এসে উপস্থিত, যা নির্দিষ্ট পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে। তাই মুসলমানদের এগিয়ে আসা উচিত মানবতাকে বাঁচানোর জন্যে, যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে মানবতার লাগাম টেনে ধরতে হবে, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে হবে। এক লহমার জন্যেও লাগাম হাতছাড়া করা যাবে না; এতে মানবতাকে বাঁচানোর সুযোগই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই দুইটি শিবির তাদের ওপর অর্পিত সকল দায়-দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। খুবই দ্রুত তারা বিফল হয়েছে। এখন ইসলাম ও মুসলমানকে নিয়েই একমাত্র আশা। এ জন্যে মুসলমানদেরকে তাদের পয়গাম ও কর্তব্য সম্পর্কে অবশ্যই অবগত হতে হবে। মুসলিম সরকার ও মুসলিম সমাজকে বুঝে নিতে হবে তাদের করণীয় কী? তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে এবং তাদের স্বজাতির ওপর ভরসা করতে হবে... আমি মনে করি এবং অনেক সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তা বর্ণনাও করেছি যে, মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে নিরাপদ এবং সবচেয়ে একনিষ্ঠ ও ওজস্বী জাতি হচ্ছে মুসলিম জাতি। বিদ্যমান সরকারগুলো যদি এ মুসলিম জাতির সহযোগিতা নিতো এবং তাদের ওপর ভরসা করে চলতো, তা হলে কতই না ভাল হতো! কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দেখা যায়- মুসলিম সরকার ও

১. আল্লামা নদভী (র.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মাযা খাসিরাল আলাম বি ইন হিতাতিল মুসলিমীন' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৮৮-২৯২।

জনগণের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। কোন কোন দেশে সরকার ও জনগণের মধ্যকার বিরাজমান যুদ্ধই বর্তমানে সবচে' সরগরম পরিলক্ষিত হয়। এ কথা আমি ঢালাওভাবে বলছি না। তবে অনেক মুসলিম সরকার ও মুসলিম জনগণের মাঝে এ অবস্থাই বিদ্যমান।

আজ আমাদের শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে অযথা জিহাদ ও নিষ্ফল সংগ্রামের মধ্যে। যারা প্রকৃত শত্রু নয়, এমন লোকদের বিরুদ্ধে আজ যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন সরকারগুলো বিশেষত আরব এবং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করেছেন, তারা যদি এ মুসলিম জাতির মূল্য বুঝতো, এ জাতির ওপর ভরসা করতো, তাদের সহযোগিতা নিতো এবং এ জাতির ভিতর যে সম্পদ আল্লাহ তাআলা নিহিত রেখেছেন তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সামনে অগ্রসর হতো... তা হলে তারা বিশ্বের পরাশক্তিরূপে পরিগণিত হতে পারতো, পৃথিবীর সেরা সেনা-ছাউনি আজ তারাই নির্মাণ করতে পারতো। কারণ, আক্বীদা ও জাতিগত এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে আছে, যা অন্যদের মধ্যে অনুপস্থিত। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল বলেন, প্রাচ্যে যত জাতি আছে তার মধ্যে মুসলিম জাতিই অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ও যে জাতির ওপর নির্ভর করা যায়। কারণ, অমুসলিম যত জাতি আছে তারা হয়ত শঠ; নয়ত বিকৃত। যে একনিষ্ঠতা প্রবলভাবে মুসলমানদের কাছে পাওয়া যায়, তার নজীর অন্য কোন জাতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ, রাসূল, আল্লাহর পথে শাহাদত, জিহাদ ইত্যাদি দীনী পরিভাষাগুলোর যে জাদু রয়েছে মুসলমানদের হৃদয়ে হৃদয়ে তা কোন দিন মোছা যাবে না, যা দিয়ে কাউকে তাড়িত বা উত্তেজিত করা যায়, যা দিয়ে কোন জাতিকে আন্দোলিত করা যায়, বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করা যায়। কারণ, তাদের পরিভাষা ও শব্দগুলো মূল্যহীন হয়ে গেছে, স্বীয় অর্থ হারিয়ে ফেলেছে বিশ্বের অপরাপর জাতিপুঞ্জের নিকট।[১]

দক্ষ দা'ঈর শিক্ষা ও সংস্কৃতি আমাদের হাসিল করতে হবে

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নিশ্চয়ই আমরা অনেক একনিষ্ঠ সাধনা, অনেক ইখলাছ প্রত্যক্ষ করে থাকি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেই একনিষ্ঠতা ও ইখলাছ ব্যয়িত হচ্ছে নিষ্ফল জায়গায়, কিংবা শরীয়ত পরিপন্থী রাস্তায় অথবা অনেক সময় দেখা যায়, শরীয়তসম্মত পথ থেকে সরে গিয়ে সেই কাজ পরিচালিত হচ্ছে। কোন কোন সময় আমরা সেই ইখলাছকে সু-নেতৃত্বের মত শরয়ী পরিভাষায় পর্যন্ত অভিষিক্ত করতে পারি না। ফলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও মুসলিম সমাজের জন্যে সমূহ ক্ষতি বয়ে আনে অথবা ইখলাছের নামে নিজের অজান্তেই ইসলামের অগ্রযাত্রায়

১. কাতার ভিত্তিক প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন 'আল-উম্মাহ কে দেয়া আল্লামা নদভী (রহ.)-এর সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

মূলতঃ এটা এক সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসা এবং এর জবাবও হবে আরো সূক্ষ্ম। কারণ, দাওয়াত হচ্ছে সে সব লক্ষ্যভেদী বিষয়ের অন্যতম, যার জন্য কোন ধরনের সীমারেখা অঙ্কন করা যায় না। যেহেতু দাওয়াতের সম্পর্ক দা'ঈর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে; সুতরাং পাশ্চাত্যের কোন কোন মনীষী বলেন, যুদ্ধ এবং শাসনব্যবস্থার জন্যে নিশ্চয়ই কোন নীতিমালা, কোন সীমারেখা থাকে না। অনুরূপ আমিও মনে করি, ইসলামী দাওয়াতের জন্যেও কোন ধরনের নির্দিষ্ট নীতিমালা কিংবা সীমারেখা নির্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা নির্ভর করে দা'ঈর জ্ঞান-গবেষণার ওপর; অর্থাৎ সমসাময়িক যুব সমাজের কিংবা কোন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর সম্পর্কে, এবং পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে একজন দা'ঈর স্টাডি অনুযায়ী তার দাওয়াতের নীতিমালা রচিত হবে। তাই আমরা কোন দা'ঈ সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারবো না যে, এখান থেকে তার দাওয়াতের যাত্রা আরম্ভ করবে আর ওখানে গিয়ে থামবে, অতঃপর এ জায়গা থেকে শুরু করে ঐ জায়গাতে গিয়ে সমাপ্ত করবে। রেলগাড়ি কিংবা সিটি কর্পোরেশনের যেমন নির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকে এ ধরনের কোন পথ নির্দেশিকা এ ক্ষেত্রে নেই। এক্ষেত্রে গোটা বিষয়টি নির্ভর করে দা'ঈর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর। আর এ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি রচিত হবে সীরাতে নববী ও কুরআনুল কারীম অধ্যয়নের ওপর. অর্থাৎ দা'ঈর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি হাসিল করতে হলে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাচার এবং কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করতে হবে। একইভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম, স্বজাতির সাথে তাদের অবস্থা এবং যুব সমাজের মন-মানস সম্পর্কেও পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। পাশাপাশি দা'ঈকে ঈমানদীপ্ত বিবেকের মালিক হতে হবে এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কেও দা'ঈকে মোটামুটি একটা ধারণা রাখতে হবে।[১]

নতুন ও সংস্কারধর্মী কিছু করতে হলে দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থাকতে হবে

হযরত হাম্বল (রঃ) বলেন, তাঁর (ইমাম আহমদের (রঃ)) জীবন-যাপন ছিলো বিশেষ ধরনের। কোন জিনিস প্রয়োজন হলে আমাদের ঘর থেকে অথবা তাঁর সন্তানদের ঘর থেকে ধার নিতেন। যখন সরকারী কিছু পয়সা-কড়ি আমাদের হাতে এলো, তিনি তখন ধার নেয়া থেকে বিরত থাকলেন। এক সময় তাঁর রোগশয্যার এক ধরনের বিশেষ থলের বর্ণনা দেয়া হলো, যা দিয়ে পানি গরম করা হয়; যখন থলেটি আনা হলো, উপস্থিত কেউ কেউ বললেন, পানি ভর্তি থলেটি তন্দুরে রেখে দাও, পানি গরম হয়ে যাবে; কারণ এক্ষুণি তাতে রুটি তৈরি করা হয়েছে। তিনি

১. কাতার ভিত্তিক প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিন 'আল-উম্মাহ'কে দেয়া আল্লামা নদভী (র.)-এর সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

হাতে ইশারা করে বললেন, না।

তিনি এসব সম্পদ একদম হারাম, তা মনে করতেন না। তবে এতটুকু মনে করতেন যে, এসব হালাল পন্থায় অর্জন করা হয়নি এবং এগুলোর সাথে মুসলমানদের অধিকার জড়িত আছে, জুড়িয়ে আছে তাদের হৃদয়। তাই তিনি এ ধরনের কিছু গ্রহণ করা থেকে পরহেজ করতেন, গ্রহণ করাকে গুনাহ মনে করতেন। একদা তিনি তার সন্তান-সন্ততিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এসব সরকারী সম্পদ কীভাবে গ্রহণ করো, অথচ দেশের সীমাগুলো অরক্ষিত, খালি পড়ে আছে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদও তার যোগ্য হকদারদের মাঝে ঠিকমত বন্টিত হয়নি। [আল-মানাক্বিব, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮৪]

এখানেই আমাদের থেমে যেতে হয় এবং মনে প্রশ্ন জাগে, ইমাম আহমদ (র)-এর এ কঠোরতা কেন? কেনইবা এ বাড়াবাড়ি? আমি বলি, এ কঠোরতা যদি না হতো, সরকারী ধন-সম্পদ থেকে এ পরিমাণ বিমুখিতা যদি না থাকতো এবং সেই জীবনপদ্ধতির মান রক্ষার জন্যে যদি এ কঠিন অধ্যবসায় না থাকতো, যা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) গ্রহণ করেছিলেন....তা হলে তিনি এ শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি কঠোর হতে পারতেন না, এর বন্ধনমুক্ত হতে পারতেন না। দীনের প্রতিরক্ষা, দাওয়াত ও ইছলাহ এবং নতুন ও সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে তিনি যে মহান ভূমিকা রেখে গেছেন তা তিনি পারতেন না। পারতেন না মানুষের মন-মানসে সেই কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে। এ কঠোর দুনিয়াবিমুখিতা না থাকলে তিনি মজবুত মহীরুহ ও অটল পর্বতের মত বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না সেই সব ভয়াবহ দুনিয়ামুখী স্রোতের সামনে যা সাধারণ তো সাধারণ, অনেক সময় বড় বড় রুই-কাতলাকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

অতঃপর তিনি আল্লাহর ওপর এ বিরল ভরসা এবং এ দুনিয়াবিমুখিতা দ্বারা হাসিল করেছেন এক অপরিমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি, অর্জন করেছেন আল্লাহর সাথে এক মজবুত সম্পর্ক এবং যে কোন সময় আল্লাহমুখী হওয়ার বিরল যোগ্যতা...যার মাধ্যমে তিনি স্বীয় মনোবৃত্তি ও তাড়নার ওপর সহজে জয় লাভ করতে পারতেন। ইসলামের ইতিহাসে আমরা সব সময় দুনিয়াবিমুখিতা ও সংস্কারকর্ম একটা আরেকটার সাথে যুগপৎভাবে সম্পৃক্ত লক্ষ্য করেছি। এ জন্যে যখনই আমরা এমন কোন ব্যক্তিত্বকে দেখি, যিনি সময়ের স্রোতধারা পালটে দিয়েছেন, ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছেন, মুসলিম সমাজে এক নতুন রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, অথবা ইসলামের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করতে সমর্থ হয়েছেন এবং দীন, জ্ঞান ও চিন্তার জগতে এমন চিরন্তন ঐতিহ্য রেখে যেতে পেরেছেন, যা যুগ যুগ ধরে মানুষের চিন্তা-চেতনায় জ্ঞান, সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। সাথে সাথে

আমরা তার মাঝে দুনিয়াবিমুখিতাও লক্ষ্য করি, প্রত্যক্ষ করি প্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত এবং পুঁজি ও পুঁজিবাদীদের মোহমুক্ত হওয়ার এক উদগ্র মানসিকতা। এর রহস্য হয়ত এটাই যে, দুনিয়াবিমুখিতা মানুষকে যে কোন পরিস্থিতি মুকাবেলা করার শক্তি যোগায়, স্বীয় বিশ্বাস ও ব্যক্তি-স্বকীয়তা বজায় রাখার মানসিকতা সৃষ্টি করে, এবং যারা দুনিয়াপূজারী, প্রবৃত্তির গোলাম, পেট পুজার শিকলাবদ্ধ... এ ধরনের দুনিয়ামুখী লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করার সাহস যোগায়। সুতরাং আপনি দেখবেন, যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে যারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, সে সব মহা মনীষীদের অনেকে ছিলেন পার্থিব জীবনে নির্মোহ, প্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত এবং যামানার বিত্তবান ও রাজন্যবর্গের নাগপাশ থেকে যোজন যোজন দূরে। কারণ, দুনিয়াবিমুখিতা অন্তরে শক্তির স্ফুরণ ঘটায়, সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে বিকশিত করে এবং রূহকে করে প্রজ্জ্বলিত। পক্ষান্তরে সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসিতা সাধারণত অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়, আত্মাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে, অন্তরকে করে দেয় জীবনামৃত।[১]

উম্মাহর দেহে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে ঃ

কোন উম্মাহ বা জাতির চেতনা হারিয়ে ফেলাটা হচ্ছে সে জাতির জন্য সর্বাধিক ভয়ানক বিষয়। কারণ, চেতনাহীন জাতি যে কোন সময়ই যে কোন বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর অচেতন জাতিরাই মুনাফিক টাইপের লোকদের খেল-তামাশার শিকারে পরিণত হয় সব সময়। সাধারণত দেখা যায়, যে জাতি গাফেল, অবচেতন, তারা কোন বাছ-বিচার ছাড়াই যে কোন আহ্বানের মায়াজালে আটকে পড়ে, কালের গড্ডালিকা প্রবাহে গা এলিয়ে দেয়, উৎপীড়কের সামনে নতশির হয়ে পড়ে এবং জুলুম-অবিচার, এমনকি যে কোন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে পর্যন্ত তাদেরকে দেখা যায় নিশ্চুপ, নির্বিকার, নির্লজ্জভাবে বরদাশত করে যাচ্ছে সব কিছু। অসচেতন জাতি যুগের চাহিদা, মন-মানস বুঝতে অক্ষম। সময় মতো, জায়গা মতো কাজ করতে অক্ষম। তারা শত্রু-মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রতারক পার্থক্য করতে পারে না। বারবার একই স্থানে আছাড় খায়, একই গর্তে দংশিত হয়। দিবাস্বপ্নে যারা বিভোর, সেই চেতনাহীন নিস্তেজ জাতি আশ-পাশের ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে উপদেশ হাসিল করে না, কোন অভিজ্ঞতা তাদের কাজে আসে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তারা সম্বিৎ ফিরে পায় না। তাদের নেতৃত্বের বাগডোর থাকে সবসময় এমন লোকদের হাতে যাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, দুর্নীতি, কাপুরুষতা, অক্ষমতা, অজ্ঞতা, অস্থির চিত্ত... ইত্যাদি সব ধরনের। ফলে এ অশুভ নেতৃত্বই তাদের পতনের কারণ হয়, লাঞ্ছিত হয় তারা। যেহেতু তারা সচেতন নয়, তাই বারবার এ ধরনের ক্ষতিকর নেতাদের ওপর আস্থা

১. আল্লামা নদভী (র) বিরচিত 'রিয়ালুল ফিকর ওয়াদ-দা'ওয়াহ'র ১ম খণ্ড থেকে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৪-১০৫।

রাখে। নিজেদের জান-মাল ইজ্জত-আব্রু এবং শাসন-ক্ষমতার সমস্ত চাবি তাদের হাতে তুলে দেয়। দ্রুত বেমালুম ভুলে যায় সে সব ক্ষতি, লোকসান ও বিপর্যয়ের কথা, যা এ সব খল-নেতাদের হাতে সংঘটিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ সব পেশাদার রাজনীতিবিদ ও দুর্নীতিবাজ নেতা পুনরায় দুঃসাহসী হয়ে ওঠে জাতির ভাগ্য নিয়ে খেলতে। তখন তারা গোটা উম্মাহ ও জাতির অসন্তোষের পরোয়া করে না, সমালোচনার তোয়াক্কা করে না। এভাবে উম্মাহর অসচেতনতার কারণে, জাতির গাফলতি ও নির্বুদ্ধিতার সুযোগে এই শঠ নেতারা তাদের অজ্ঞতাসুলভ কর্মকাণ্ডে আরো বেপরোয়া হয়ে যায়, নির্বিবাদে চালিয়ে যায় তাদের দুর্নীতির মহড়া, উম্মাহর ভাগ্য নিয়ে নিষ্ঠুর এক খেলা।

দুঃখের বিষয়, মুসলিম জাতিগুলো এবং আরব বিশ্বের দেশগুলো এ সচেতনতার ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়ভাবে দুর্বল। (সংকোচ বোধ হলেও বলতে হচ্ছে) তারা আজ চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা শত্রু-মিত্র চিনতে পারে না। দোস্ত-দুশমন উভয়ের সাথে একই ধরনের আচরণ করে। অনেক সময় হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর চেয়েও বেশি ভাল ব্যবহার করে বসে দুশমনের সাথে। দেখা যায়, সব ধরনের ফায়দা হাসিল করে যাচ্ছে শত্রু, আর বন্ধু সাথে থেকেও আছে অবহেলিত; কষ্ট-ক্লান্তিতে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সারাটা জীবন। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একবার নয়; হাজারবার দংশিত হচ্ছে একই সাপের গর্তে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনা কিংবা তিক্ত অভিজ্ঞতা...কোন কিছুতেই এখন তাদের চৈতন্যোদয় হয় না। নিতান্তই দুর্বল স্মৃতিশক্তি। দ্রুত বিস্মৃত হয়ে যায় রাজনৈতিক নেতাদের অতীত। কাছের কি দূরের, সব ধরনের ঘটনাই তারা বেমালুম ভুলে যায়। শুধু কি তাই! ধর্মীয়, সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও তারা দুর্বল, সব চেয়ে বেশি দুর্বল রাজনৈতিক সচেতনতায়। যার কারণে আজ তাদের ওপর একের পর এক ভয়াবহ বিপর্যয় আসছে, অবতীর্ণ হচ্ছে ভয়ানক সব বালা-মুছিবত, দুর্ভাগ্য যেন তাদের লেগেই আছে নিরন্তর। জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে আছে তাদের বুকের ওপর নিষ্ফল নেতৃত্বের বোঝা, যা তাদের অপমানিত করছে জীবন যুদ্ধের প্রতিটি ময়দানে।

পক্ষান্তরে ইউরোপীয় জাতিরা (রূহ ও চরিত্রের ক্ষেত্রে তাদের দেওলিয়াপনা এবং আমাদের গবেষণায় প্রমাণিত সমূহ দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও) চেতনার দিক দিয়ে শক্তিশালী। জাতীয় ও রাজনৈতিকভাবে তারা খুবই সচেতন। বলতে গেলে তারা আজ রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় পরিণত বয়সে উপনীত। তারা তাদের লাভ-লোকসান চিনতে ভুল করে না। প্রতারক-হিতাকাঙ্ক্ষী, মুখলেছ-মুনাফেক, যোগ্য-অযোগ্য তারা সহজেই পার্থক্য করতে পারে। সুতরাং আমানতদার, ক্ষমতাবান যোগ্য ব্যক্তিদের হাতেই দিয়ে থাকে নেতৃত্বের বাগডোর। দায়িত্ব দিয়েও অসতর্ক থাকে না তারা। নেতানেত্রীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তারা সদা সজাগ-সচেতন। তাদের

মাঝে যদি কোন অক্ষমতা কিংবা দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়, অথবা দেখে, যার যা ভূমিকা তা পালন করে ফেলেছে, দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে... তখন সেই নেতা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর স্থলে তুলনামূলক আরো শক্তিমান, আরো যোগ্য লোক নিয়োগ দেয়। দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কোন ব্যক্তিকে কোন পদ থেকে সরাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। উজ্জ্বল অতীত, মহান কীর্তিগাঁথা, যুদ্ধ জয় অথবা কোন কাজে বিশেষ সফলতা... ইত্যাদি কোন কিছুই এ ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যার ফলে তারা পেশাদার রাজনীতিক, দুর্বল নেতৃত্ব এবং দুর্নীতিবাজ আমলা থেকে সর্বদা নিরাপদে থাকে। তাদের এ সচেতনতার দরুণ তাদের নেতা ও প্রশাসনের লোকেরাও থাকে সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত। নেতৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে থাকে সদা সজাগ। পাছে লোক কিছু বলে-এ ভয়ে। জাতির সমালোচনা ও শাস্তির আশঙ্কা এবং জনগণের ধর-পাকড়ের ভয়ে তাদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতেই হয়।

অতএব, এ মুসলিম উম্মাহর যোগ্য কোন খিদমত করতে হলে, জাতির লাঞ্ছনার বোঝা লাঘব করতে হলে, অব্যাহত দুঃখ-দুর্দশা হতে উম্মাহকে বাঁচাতে হলে উম্মাহর শিরায় শিরায় সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, শাখা-প্রশাখায় চৈতন্যোদয় ঘটাতে হবে। তৌহিদী জনতাকে রাজনৈতিক-সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টি মানে যে শুধু শিক্ষা বিস্তার বা নিরক্ষরতা দূরীকরণ নয়-তা বলা বাহুল্য। তবে শিক্ষা বিস্তার ও স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি সচেতনতা সৃষ্টির সহায়ক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর মুসলিম রাজনীতিবিদ ও নেতাদের মনে রাখতে হবে, নিশ্চয়ই যে জাতির মধ্যে সচেতনতার অভাব আছে, সে জাতির ওপর কোন দিন আস্থা রাখা যায় না, সে জাতির অবস্থা কোন ধরনের স্বস্তি যোগায় না। নেতা ও নেতৃত্ব যতই থাকুক। যতই তারা বলাবলি করুক। যত দিন ঐ জাতি সচেতনতার ক্ষেত্রে দুর্বল থাকবে, ততদিন তারা অপরের প্রোপাগান্ডা, বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ও খেল-তামাশার শিকারে পরিণত হবে খোলা ময়দানে পড়ে থাকা পাখির সেই পালকের মতো, যাকে নিয়ে খেলা করে পূবালী, দখিনা...চতুর্মুখী হাওয়া। ফলে তা এক জায়গায় আর স্থির থাকতে পারে না। কখনো এদিক, কখনো ওদিক। এভাবে চতুর্দিকে লক্ষ্যহীনভাবে শুধুই ছোটাছুটি করে।[১]

সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে প্রয়োজন আরো বেশী যোগ্যতার, আরো বেশী প্রস্তুতির ঃ

শোন ভাই! মুসলিম সমাজের চিন্তা-জগতে আজ এক ব্যাপক নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই উম্মাহ এবং এই দীনের মাঝে যে চিরন্তন যোগ্যতা

১. আল্লামা নদভী (রহ.) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মা যা খাছিরাল আলম বি ইন হিতাতিল মুসলিমীন' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৭-২৯৮।

গচ্ছিত রাখা হয়েছে, সেই যোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে যুবসমাজ এবং আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভয়ানক অনাস্থা-অনিশ্চয়তা দানা বেঁধে উঠছে। সর্বোপরি দীনের ধারক-বাহক আলেমদের নতুন প্রজন্মে মারাত্মক হতাশা ও হীনমন্যতা শিকড় গেড়ে বসছে। এগুলো দূর করে যুগ ও সমাজের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং দীন ও শরীয়তকে নয়া যামানার নয়া তুফান থেকে রক্ষা করার জন্য এখন অনেক বেশী প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন। অনেক বড় ইলমী জিহাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় অর্জনের প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন আরো বেশী আত্মনিবেদনের, আত্মবিসর্জনের এবং আরো ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়নের।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের পূর্বসূরীগণ অনেক কালজয়ী কীর্তি ও অবদান রেখে গেছেন। বিশেষত আমাদের নাদওয়াতুল উলামার প্রথম কাতারের লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদগণ তাদের সময় ও সমাজকে অনেক কিছু দিয়েছেন এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট আশ্বস্ত করতে পেরেছেন। যে সব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা তখন 'জ্বলন্ত' ছিলো সেগুলোর ওপর চিন্তা-গবেষণার যে ফসল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান তারা রেখে গেছেন, তা সে যুগের জন্য খুবই কার্যকর ও যুগান্তকর ছিলো। কিন্তু সেগুলোর চর্বিত চর্বণ এখন বিশেষ কোন কৃতিত্ব বলে গণ্য হবে না এবং তাতে যুগ ও সমাজের হতাশা দূর হবে না।

জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্র এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইলমের যে প্রাচীন ভাণ্ডার ও গুপ্ত সম্পদ পূর্ববর্তী আলেমদের কল্পনায়ও ছিলো না, আধুনিক প্রকাশনা বিপ্লবের কল্যাণে এবং বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন দিনের আলোতে চলে এসেছে। আগে যে সব কিতাবের শুধু নাম শুনেছি, এখন তা গ্রন্থাগারের তাকে তাকে শোভা পায়। তাছাড়া চিন্তার পথ ও পন্থা এবং অস্থির চিত্তকে আশ্বস্ত করার উপায়-উপকরণে এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, পুরনো ধারার অনুকরণ এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। সে যুগের বহু আলোচনা এখন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিল যখন আল্লামা শিবলীর 'আল-জিযয়া ফিল ইসলামকে মনে করা হতো মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। 'এক নজরে আওরঙ্গজেব' তো ছিল রীতিমত বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয়। একইভাবে 'আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার' ছিল ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব। কিন্তু এখন তা এতই গুরুত্বহীন যে, এ সম্পর্কে বলার বা লেখার নতুন কিছুই নেই এবং যুগ ও সমাজের তাতে তেমন আগ্রহও নেই। এ যুগে কোন কীর্তি ও কর্ম রেখে যেতে হলে এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি পেতে হলে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত জ্ঞান-গবেষণা ও ইলমী সাধনার প্রয়োজন। কেননা, সময়ের কাফেলা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে অনেক সামনে।

পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানসম্পদ অবশ্যই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এর সাথে জড়িয়ে আছে মূল্যবান স্মৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য। এগুলো এখন আমাদের অস্তিত্বেরই অংশ। কিন্তু সময় বড় নির্দয়। যামানা বড় বে-রহম। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যত বিশাল হোক, প্রতিভার প্রভা যত সমুজ্জ্বল হোক এবং জামাত ও সম্প্রদায় যত ঐতিহ্যবাহী হোক, সময় কারো সামনেই মাথা নোয়াতে রাজী নয়। যুগের স্বভাবধর্ম এই যে, যোগ্যতার দাবিতে স্বীকৃতি আদায় না করলে আগ বাড়িয়ে সে কাউকে স্বীকার করে না। কোন কিছুর ধারাবাহিকতা বা প্রাচীনতা সময়ের শ্রদ্ধা লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সময় এমনই বাস্তববাদী, এমনই শীতল ও নিরপেক্ষ যে, তার হাতে নতুন কিছু তুলে না দিলে এবং তার ঘাড়ে ভারী কোন বোঝা চাপিয়ে না দিলে সে মাথা নোয়াতে চায় না। সময়ের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করা এত সহজ নয় এবং শুধু ঐতিহ্যের দোহাই যথেষ্ট নয়। সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি পেতে হলে, ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে হলে এবং আত্মগর্বী সমাজের মন-মগজে যথাযোগ্য স্থান পেতে হলে প্রতিভা ও যোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ দিতে হবে এবং ব্যক্তিত্বের উচ্চতা আরো বাড়াতে হবে, যে উচ্চতা ছাড়িয়ে যাবে হিমালয়ের শৃঙ্গকে।[১]

কুরআন ও সীরাতে মুহাম্মদ (সা) হচ্ছে দুই মহাশক্তি ঃ

কুরআন ও সীরাতে মুহাম্মদ (সা) তথা মুহাম্মদ (সা)–এর জীবনী হচ্ছে এমন দুই মহাশক্তি, যা মুসলিম বিশ্বের দেহে ঈমান ও সাহসের আগুণ জ্বালিয়ে দিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে যে কোনো সময় এক মহাবিপ্লব জাহেলী যুগের বিরুদ্ধে। একটি পতিত ঘুমন্ত দুর্বল জাতিকে তা এমন এক শক্তিশালী চির যৌবনা জাতিতে পরিণত করতে পারে, যার ভিতর দাউ দাউ করে জ্বলবে তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদার অনল; যে জাতি রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়বে জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে, সকল জালিম শাহীর বিরুদ্ধে।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচে বড় রোগ হচ্ছে শুধুই পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্টি, পারত্রিক জীবন বাদ দিয়ে পার্থিব জীবন নিয়ে যারপরনাই স্বস্তিবোধ, নষ্ট পরিবেশের মধ্যে প্রশান্তি লাভ এবং এ জীবনেই অতিমাত্রায় শান্তি খোঁজার মানসিকতা। ক্ষণিকের এ জীবনে মুসলিম বিশ্ব এতই নিমগ্ন যে, কোনো ফিৎনা-ফ্যাসাদ তাকে বিচলিত করে না, কোনো বিকৃতি তাকে অস্থির করে না, অসৎ কর্ম পারে না তাকে উত্তেজিত করতে। খাওয়া-পরার বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছুই মুসলিম বিশ্বকে আজ ভাবায় না। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও সীরাতুন্নবী (সা) যদি হৃদয়ে ঢুকতে পারে, এর প্রভাবে সংঘাত সৃষ্টি হয়ে যায় ঈমান ও নেফাকের মধ্যে, হয়ে যায় সেই দুই মহাশক্তির প্রভাবে দেহের সাময়িক সুখ-শান্তি এবং হৃদয়ের অনিঃশেষ নেয়ামতের

১. আল্লামা নদভী (রহ.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৯-৮১।

মাঝে, সর্বোপরি বেকারত্বের জীবন ও শাহাদাতের মৃত্যুর মাঝে। এ সংঘাত ও যুদ্ধই সৃষ্টি করেছেন যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ। এ ধরনের সংঘাতের মাধ্যমেই পৃথিবীর সংশোধন সম্ভব হতে পারে। মানুষের মাঝে যদি এ সংঘাত জন্ম নিতে পারে, তখন দেখা যাবে, মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় নয় শুধু; বরং প্রত্যেক মুসলিম দেশের প্রতিটি মুসলিম পরিবারে জন্ম নিচ্ছে আসহাবে কাহাফের মতো ঈমানদীপ্ত যুব-সমাজ, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

'তারা ছিলো কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনো তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করবো না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১৩-১৪)

তখন সেখানে দেখা যাবে, মুসলিম বিশ্বের স্বর্ণালী স্মৃতিগুলো আবার তাজা হচ্ছে। হযরত বেলাল, আম্মার, খাব্বাব, খুবাইব, সুহাইব, মুসআব ইবন উমাইর, উসমান ইবন মাজউন, আনাস ইবনু নাদার (রা) প্রমুখের কীর্তিগুলোর নবায়ন ঘটছে পুনর্বার। সেখানে মৌ মৌ গন্ধ ছড়াবে জান্নাতের মন মাতানো সৌরভ, প্রবাহিত হবে ইসলামের প্রথম শতাব্দীর সুবাতাস। তখন জন্ম নিবে ইসলামের এক নতুন বিশ্ব, যার সাথে পুরাতন বিশ্বের কোনই মিল থাকবে না।[১]

গোটা মানবতাকে ঋণী করেছে মুহাম্মদ (সা)–এর আবির্ভাব

ইসলাম যে কত বড় নেয়ামত! আরব উপদ্বীপকে অবশ্যই তা জানতে হবে, অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না। আপনারা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলার অনুমতি দিন... সেই মহান নেয়ামতের সামনে আরব উপদ্বীপের কখনোই অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়, যে নেয়ামত আরবদের এ উপদ্বীপকে বের করেছে অখ্যাতি ও আত্মহননের জগৎ থেকে, বের করেছে সেই নিকৃষ্ট ও কুৎসিত জাহেলিয়াত থেকে, যা ছিল অজ্ঞতা ও তুচ্ছতার গভীর সাগরে নিমজ্জিত। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুহাম্মদ (সা)–এর আবির্ভাব এ আরব উপদ্বীপকে শূন্য থেকে বের করে সব কিছুর মেলায় বসিয়েছে। এই উপদ্বীপে আজ কল্যাণকর যা কিছুই এসেছে, সবই মুহাম্মদ (সা)–এর আবির্ভাবের বদৌলতে এসেছে। এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ইসলামের কবি ড. মুহাম্মদ ইকবালের একটি কবিতা। উল্লেখ্য, ড. মুহাম্মদ ইকবাল হচ্ছেন ইসলামী বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বের ভাষ্যকার। তিনি বলেন,

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মা যা খাছিরাল আলম বিইন হিতাতিল মুসলিমীন' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭৮।

'নবী-এ উম্মী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুবাতাস প্রবাহিত হলো। তাঁর পবি মুখ, যা ওহী ছাড়া কোনো কথাই বলে না; তা থেকে গড়িয়ে পড়লো জীবনের এ ফোটা পানি। অতঃপর জন্ম নিলো রকমারি ফুলের বাগান, সৃষ্ট হল ফুলে ফলে ভর মরুদ্যান। ফলে গোটা আরব সাহারায় বয়ে গেলো মন মাতানো সৌরভ।'

সুতরাং ভাইয়েরা আমার! আপনারা নিজেদেরকে মূল্যায়ন করুন। দূর অতীতে ফিরে দেখুন; বরং বেশি দূরে যেতে হবে না। নিকট অতীতে ফিরে তাকান চৌদ্দটি শতাব্দীর ব্যাপার, বিশেষ বড় কোনো জটিল ব্যাপার নয়। নিকট অতীতে ফিরে তাকালেই চলবে। আরব উপদ্বীপ কোথায় ছিল? কোথায় ছিল আরব জাতি কোথায় ছিল এ সব রাজ্য (এসবের জন্য আমার দোয়া ও মূল্যায়ন সত্ত্বেও): কোথায় ছিল এ সৌদি আরব? আল্লাহ এদেশকে যাবতীয় ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করুক। পাকিস্তান ও ইরান কোথায় ছিল? কোথায় ছিলাম আমরা? আজ আমরা এ মহতী অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়েছি, সীরাতুন্নবীর অনুষ্ঠানে প্রিয় নবী (সা)-এর সুন্নাতের আলোচনায় জমায়েত হয়েছি। না, আল্লাহর কসম! যদি হাজার বছরও অতিবাহিত হতো, যারা স্বপ্নদ্রষ্টা তারা যতই স্বপ্ন দেখুক, যতই কবিরা কবিত লেখুক, সাহিত্যিকরা বই লেখুক এবং গণকরা যতই ভবিষ্যদ্বাণী করুক না কেন.. এই আরব জাতি এবং এ আরব উপদ্বীপের ভাগ্যে বিজয় কেতন উড়ানো সম্ভ হতো না, তাদের কথাও কেউ শুনতো না, যদি মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাব ন হতো।[১]

মানবতার সম্মান ও মূল্যায়ন করতে হবে ঃ

আজকের সমাজ মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পৃথিবীতে মানুষেরও একটা মূল্য আছে, তার অবস্থান আছে-এ কথা আধুনিক সমাজ স্বীকার করতে নারাজ। এমনই এক নাজুক মুহূর্তে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র উঠলেন, তাঁর বলিষ্ঠ কবিতামালায় তুলে ধরলেন সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা। অত সাহিত্য এবং পরাজিত ও পশ্চাৎপদ কাব্যচর্চার ধ্বংসস্তূপের নীচে পিষ্ট হয়ে যাওয় মানবতার সম্মানকে আবার ফুটিয়ে তুললেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত উঁচুমানে সাহিত্যালঙ্কার, ঈমান ও অমিত সাহসিকতার সাথে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন, নিরন্তর গেয়ে গেলেন মানবতার গান। এক সময় সমাজের গাবে জীবনের ছোঁয়া আছড়ে পড়ে প্রাণ সঞ্চারিত হলো সমাজের মৃত দেহে। মানুষ তা সম্মান বুঝতে লাগলো, চিনতে লাগলো এবং জানতে শুরু করলো তার মর্যাদা কী মাওলানা রূমীর গাওয়া জীবনের শক্তিশালী সুরগুলো, মানবতার গানগুলো (অর্থা

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত 'ফী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলি খণ্ড ঃ ১ম পৃষ্ঠা ঃ ২৯৫-২৯৬।

ইসলামী সাহিত্যের সুষমাগুলো) প্রতিধ্বনিত হলো মানব সমাজ। কবিদের কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁর কবিতামালা পুনরাবৃত্তি হলো, তাঁর সুরে সবাই সুর মিলালো। আধ্যাত্ম জগতে সৃষ্টি হলো এক নতুন ঢেউ, যাকে 'মানবতার সম্মাননা' দিয়েই নামকরণ করা যায়।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র) তাঁর কবিতার পাঠক ও ছাত্রদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সবচে' সুন্দর অবয়বে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'আমি সৃষ্ট করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে।' (সূরা তীন ঃ ৪)

এ যেন মানুষের জন্য নির্ধারিত এক সুন্দর পোশাক যা তার কাঠামো অনুপাতে তৈরি হয়েছে। অন্য কোন সৃষ্টির গায়ে এ পোশাক ফিট হবে না। আল্লামা রূমী তার পাঠকদেরকে সূরা তীন অধ্যয়নের জন্য, তার অন্তর্নিহিত অর্থগুলো অনুধাবনের জন্য উৎসাহিত করতেন এবং সূরায় বর্ণিত 'আহসানি তাকভীম' শব্দদ্বয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। কারণ, এটা মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এতে অন্য কেউ অংশীদার নেই।[১]

মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কি হারালো?

আজকের বিশ্ব মুসলমানের অধঃপতনে তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বিশ্বের মাঝে যা কিছু সবচেয়ে দামী এবং যার প্রয়োজন বিশ্বের সবচে বেশি তাই হারিয়ে ফেলেছে, হারিয়ে ফেলেছে তার মূল্য। কারণ, মুসলমানরাই বিশ্বকে মূল্যবান করেছিলো, বিশ্বের স্থায়িত্ব এবং বিশ্বের মাঝে জীবন-যাপনের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলো এ মুসলমানরাই। তারাই দেখিয়েছে বিশ্বকে তার কাঙ্ক্ষিত গতিপথ। জীবনের লক্ষ্য কী? মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হলো? কেনই বা সৃজিত হলো এ বিশ্ব চরাচর? এতসব উপাদান-উপকরণ, যা মহান আল্লাহ জলে-স্থলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখেছেন, এগুলো সৃষ্টির পিছনে রহস্য কী? এবং মানুষের বিবেক এই মহাশক্তি গুণাগুণগুলো খুলে খুলে ব্যাখ্যা করেছে, মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করেছে। একমাত্র মুসলমানরাই সেই পয়গামের বাহক যা দিয়ে মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার সেই ব্যাপক, প্রশস্ত, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, যার আলোকে গোটা জগত সৃষ্টি করেছেন তিনি, সেই গভীর সূক্ষ্ম হিকমত যাকে সামনে রেখে আল্লাহ মানুষ সৃজন করেছেন এবং তাকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এ পৃথিবীতে... তার সবই ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অধিকার ছিলো মুসলমানদেরই।[২]

১ আল্লামা নদভী (রহ.) বিরচিত 'ইয়ালুল ফিকর ওয়াদ-দা'ওয়াহ'র ১ম খণ্ড থেকে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯।
২. সৌদির রিয়াদস্থ কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত আল্লামা নদভী (র) এর ভাষণ থেকে নির্বাচিত।

ইসলামী তরবিয়তের চিত্র ঃ

আপনি তো বেশ কয়েক দশক ধরে ইসলামী তরবিয়তের এক অগ্রণী চিত্র উপস্থাপন করে আসছেন, বর্তমানে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ইসলামী তরবিয়তে স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? তা কি সরাসরি সাক্ষাতে আদলে বলবৎ থাকবে, নাকি অন্য কোনো চিত্রে দেয়া যেতে পারে এই ইসলামী দীক্ষা বা তরবিয়ত?

দীক্ষা বা তরবিয়তের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দিক আছে খুব প্রভাব বিস্তার করে যেমন, ছাত্র শিক্ষকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এমন ঘনিষ্ঠভাবে যে ছাত্র শিক্ষকের সাথে সফর করবে, তার সঙ্গে বেশ কিছুদিন সময় অতিবাহিত করবে অবলোকন করবে, শিক্ষক কীভাবে তার ঈমানের হেফাজত করে, তার করণীয় দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেয়? এভাবে একে একে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করবে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যেকার সম্পর্ক নিছক বই কিংবা শুধু পঠন-পাঠনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং আগের যুগের মত আরো ফলদায়ক ও উপকারী হতে হবে। ছাত্ররা শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ স্থায়ী সম্পর্কে গড়ে তুলবে, এক সাথে সময় কাটাবে, এক সাথে ভ্রমণ করবে। ছাত্ররা শিক্ষকদের সেবা-যত্ন করবে, সঙ্গে থেকে প্রত্যক্ষ করবে, শিক্ষক কীভাবে নামায আদায় করেন, কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করেন। দেখবে, শিক্ষকের জীবনে যা তিনি পড়েছেন, যা কিছু জেনেছেন...তার প্রভাব কতটুকু পড়েছে, কতটুকুই বা প্রভাব পড়েছে ইবাদতের.. তাও অনুভব করবে।

এখনকার মাদ্রাসা-ই নিজামিয়াগুলোতে তা কি সম্ভব?

সম্ভব, যদি সেখানকার দায়িত্বশীলরা এক্ষেত্রে একটু সযত্ন প্রয়াস চালান, একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষকের সাথে ছাত্রের সম্পর্ক যেন শুধু মাদ্রাসার গন্ডির ভিতর সীমিত না থাকে; বরং এ সম্পর্ক হতে হবে বর্তমানের চেয়ে আরো প্রশস্ত, আরো ব্যাপক।

অতীতে মাতা-পিতা সন্তানদেরকে খ্রিস্টান অথবা ইহুদী কিংবা মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতো। অর্থাৎ যার যা পরিবেশ সে হিসেবে গড়ে তুলতো। কিন্তু আজ এমন কিছু প্রভাবক জিনিস বের হয়েছে যা প্রায় মাতা-পিতার মতই সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

নতুন প্রজন্মের সদস্যরা এই আধুনিক তরবিয়তের মোকাবেলা কীভাবে করতে পারে?

মাদ্রাসাসমূহে নির্বাচিত শিক্ষক থাকতে হবে। এমন শিক্ষক, যারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাদের শিশু-কিশোরদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে, যুব-মানস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। নবপ্রজন্মকে ঢেলে সাজানোর এবং তাদেরকে ইসলামী রঙে গড়ে তোলায় আগ্রহী হতে হবে। এ জন্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত সার্টিফিকেটের ওপর নির্ভর করলে চলবে না; বরং দীনের সাথে তাদের আমলী সম্পর্ক কতটুকু দেখতে হবে। দীনের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কতটুকু সন্তুষ্ট, দেখতে হবে। শিক্ষকদের জীবনে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল নিয়ে আমলী পরীক্ষার কিছুটা হলেও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আসলাফদের ন্যায় তাদের চরিত্রে দুনিয়াবিমুখিতার ছাপ থাকতে হবে। কারণ, তারা-ই যে আদর্শ। ঈমান-আখলাক, জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠন....সব ক্ষেত্রে তারাই যে অনুকরণীয়। কিন্তু আজ ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর, এমনকি পড়ার সময়ের ভিতর সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।[১]

জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় হওয়ার উত্তম পন্থা

ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যক্তিদের প্রিয়ভাজন ও জননন্দিত হওয়ার বহু কাহিনী আমরা কিতাবের পৃষ্ঠায় পড়ি এবং তা আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সমষ্টি ও জাতীয় পর্যায়ে 'মাহবুব' বা প্রিয়ভাজন হওয়ার ঘটনাবলীর ব্যাপারে আমরা গাফিল ও উদাসীন। আল্লাহ পাক যখন এ উম্মতকে 'জগতপ্রিয়' ও বিশ্বনন্দিত মিল্লাতে পরিণত করেছিলেন, যেমন এ মিল্লাত মানবতা রক্ষা ও তার বিকাশ সাধনে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ কুরবানী করেছিল এবং ন্যায় ও সত্যের আঁচল মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরেছিল, তখন চীন দেশের মত দূরদেশ থেকে আরবের আব্বাসী সালতানাতের দরবারে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় এ মর্মে যে, আমাদের দেশে এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না, যাদের ওপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে মামলা-মুকাদ্দমায় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচারে আশ্বস্ত হওয়া যেতে পারে। আল্লাহর নামে খলীফাকে অনুরোধ, তিনি যেন এমন কিছু বিচারক পাঠিয়ে দেন যারা মামলা-মুকাদ্দমায় ন্যায় ও নিরপেক্ষ ফায়সালা করে বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। এটা হলো মিল্লাতের 'মাহবুব' বা প্রিয়ভাজন হওয়ার স্তর ও মর্যাদা। এটা সেই সময়ের অবস্থা যখন এ মিল্লাতের ঈমান ও বিশ্বাস ছিল ঃ 'কুন্তুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস' অর্থাৎ বিশ্বমানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে উত্থিত শ্রেষ্ঠ উম্মত তোমরা' এর ওপর। যারা

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া ঃ ১৩৩৮ নং সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

বিশ্বাস করত, স্বার্থ সিদ্ধি, পারিবারিক ও বংশীয় আভিজাত্য ও গৌরব অর্জন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি; বরং মানবতার সেবা ও বিশ্বজনীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্থায়ী সাফল্যের পথ নির্দেশের স্বার্থে আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ বিষয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। রোমানদের মোকাবিলায় যুদ্ধরত হযরত আবু 'উবায়দাহ (রা)-এর পরিচালনাধীন ইসলামী ফৌজ (সিরিয়ার) হিমসে অবস্থান করছিল। সেখানকার অমুসলিমদের নিকট থেকে জিযিয়া (নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা কর) আদায় করা হয়েছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে দরবারে খিলাফত থেকে নির্দেশ এল ইসলামী বাহিনীর সকল সৈনিককে 'ইয়ারমুক' রণক্ষেত্রে সমবেত হতে। কারণ সেখানে চূড়ান্ত যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সেনাপতি হযরত আবু 'উবায়দাহ নির্দেশ জারী করলেন সেনাবাহিনী স্থানান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ইয়ারমুক অভিমুখে রওনা হয়ে যেতে এবং অমুসলিম সংখ্যালঘুদের নিকট থেকে গৃহীত 'জিযিয়া' ফেরত দিত। খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন, একটি পয়সাও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইয়াহুদী খ্রিষ্টান নাগরিকদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ তাদের ফেরত দেয়া হলে তারা ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল; এমন করা হচ্ছে কেন? সেনাপতি আমীনুল উম্মাহ জবাব দিলেন, আপনাদের নিকট থেকে এ কর উসূল করা হয়েছিল এ ভিত্তিতে, আমরা আপনাদের হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করব। আমরা এখন অনিবার্য কারণে সে দায়িত্ব পালন করার অবকাশ পাচ্ছি না। কারণ আমরা এখন অন্য স্থানে অভিযানে আদিষ্ট হয়েছি। আমরা কবে পর্যন্ত এখানে ফিরে আসব তা নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা নেই। সুতরাং আপনাদের নিকট থেকে গৃহীত অর্থ রাখার অধিকার আমাদের নেই। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সেনাপতির জবাব শুনে (সে বিধর্মী) লোকেরা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তারা বলেছিল, আল্লাহ তোমাদের আবার ফিরিয়ে আনুন। তারা তাদের পুরাতন মনিবদের তুলনায় মুসলমানদের শাসনাধীন থাকাকে প্রাধান্য দিত। তারা বলত, ওরাতো আমাদের নিকট থেকে ভারি ট্যাক্স উসূল করত এবং আমাদের রক্ত শোষণ করত, অথচ আমাদের সাথে তোমাদের আচরণ তো এই দেখলাম। এ হলো মিল্লাতের 'জনপ্রিয়' হওয়ার যুগের কাহিনী।[১]

শূন্যস্থানটি আরব মুসলমানরাই পূরণ করতে পারে

বর্তমান মানব বিশ্বের মানচিত্রে একটি মাত্র শূন্যস্থান রয়েছে। আর তা পূরণ করতে পারে কেবল মুসলমানই। এ শূন্যস্থানটি পূরণ করতে পারে একমাত্র সেই আরব মুসলিম উম্মাহ যারা সপ্তম ও তৎপরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে গোটা মানবতার

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা, ৮১-৮২।

নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজও যদি মুসলিম উম্মাহ তাদের মূল্য বুঝতে পারে, আজ যদি তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুধাবন করতে পারে, বুঝতে পারে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও পয়গামের গাম্ভীর্যতা... তা হলে এ যুগেও তারা ইসলামের মানবতাবাদী পয়গামের আলোকে বিশ্ব নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। সুতরাং কবে জাগবে এ মুসলিম আরবী উম্মাহ? নব উদ্যমে আবার কখন বহন করবে সেই মহান পয়গাম? কখন ধারণ করবে সেই একক আলো? আমরা সেই প্রতীক্ষায় আছি। কারণ, সে যে পবিত্র ধর্ম ইসলামেরই আলো। এখনো আছে সেই আলো আরবদের নিকট কুরআনের পরতে পরতে, নবী করীম (সা) এর সীরাতের পাতায় পাতায়। আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীরা আজও চেয়ে আছি সেই জাজিরার পানে, যেখানকার একটি জাতি নেতৃত্ব দিয়েছিল একদা বিশ্বময়, বহন করে নিয়েছিল। সর্বত্র এক মহাপয়গাম।[১]

ইখলাস ও খাঁটি নিয়ত বৃথা যায় না

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) প্রায়ই বলতেন, এটা বার বার পরীক্ষিত যে, মুখলেস (খাটি নিয়তওয়ালা) ব্যক্তির পরিশ্রম কখনও বৃথা যায় না। মুখলেস ব্যক্তির দৃষ্টান্ত সেই নৌকার মাঝির ন্যায়, যার নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে পড়ায় তীরবর্তী দর্শকগণের অন্তর ভয়ে দুরু দুরু করতে থাকে, কিন্তু সে নৌকা দেখা যায় ডুবতে ডুবতে তীরে এসে ভিড়ে। আর গায়রে মুখলেস ব্যক্তিদের নৌকা তীরে পৌছতে পৌছতে ডুবে যায়। আমার দীর্ঘ জীবনে আমি লক্ষ্য করেছি-কোন ব্যক্তির খ্যাতি ষোলকলায় পূর্ণ হলে, সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ; কিন্তু দেখা যাবে তার জীবদ্দশায় অথবা তার মৃত্যুর পর এ খ্যাতি লুপ্ত হতে শুরু করেছে। আর যদি তার সম্পর্কে কোন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষক সমালোচনা করতে শুরু করে, তবে তার প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতার অপমৃত্যু ঘটে।

অপরদিকে কোন অপ্রসিদ্ধ, নির্জনবাসী ব্যক্তি বসে বসে কল্যাণের কাজ করতে থাকে, তার ইখলাসপূর্ণ কাজ তার জীবদ্দশায় প্রসিদ্ধি লাভ না করাতে পারলেও হঠাৎ করে কোন কারণে তার কর্ম এমন প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে যে, তার প্রতিটি ক্ষুদ্র কাজ ও প্রচেষ্টা তাকে পৃথিবীতে অমরত্ব দান করে। তার কবুলিয়াতের (গ্রহণযোগ্যতার) জন্য মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর তরফ থেকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা দেখে বিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়।[২]

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত 'আল ইসলাম ওয়াল হাদারাতুল ইনসানিয়াহ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮।

২. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান রচিত 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৮।

দাওয়াত ও আমলের পদ্ধতি

আন্তরিক কল্যাণকামিতা সত্ত্বেও ইসলামী চিন্তা, দাওয়াত ও আমলের পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। নদওয়াতুল উলামায় আপনাদের গৃহীত পদ্ধতি এবং উস্তাদ আবুল আলা মওদূদী কর্তৃক গৃহীত ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতের পদ্ধতির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। বিষয়টার ব্যাখ্যা জানতে পারি কি?

এখানে মৌলিক বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। তবে যা আছে তা হচ্ছে স্টাইল বা পদ্ধতিগত বিরোধ। কোনো বিষয়কে আগে কিংবা পরে পেশ করা নিয়ে মতভিন্নতা। অথবা অগ্রাধিকারভিত্তিক অনৈক্য। উস্তাদ মওদূদী সাহেবের দাওয়াতী স্টাইলে রাজনৈতিক দিকটা প্রভাবিত বেশি। তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দেন রাজনৈতিকভাবে তথা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পেশ করেন। আর এ রকম হওয়াটা স্বাভাবিক। আমরা এ জন্যে তাকে তিরস্কার করি না। তবে দীনে ইসলাম মানুষকে বোঝাতে হবে এমন এক চিরন্তন দীন হিসেবে, যা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক প্রজন্মের জন্যে উপযোগী, প্রতিটি সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম। তা যে কোনো সময়ে পালিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যেখানে দীনী মূলনীতিসমূহের শাসন চলবে সর্বত্র। অর্থাৎ সর্বাগ্রে জোর দিতে হবে দীনের মৌলিক বিষয়ে। যেমন, মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি বিশ্বাস, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলাকে সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে চেষ্টা চালানো এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার আগ্রহ পোষণ। এগুলোই কাজের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। ক্ষমতার বিস্তার এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা... এসব বিষয় আসবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গে আমার একটি গ্রন্থ আছে। শিরোনাম হচ্ছে 'আত-তাফসীরুস সিয়াসী লিল ইসলাম' (অর্থাৎ, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা) মূল গ্রন্থ রচিত হয়েছে আরবী ভাষায়। এতে আমি পাঠকদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছি যে, ইসলামের ব্যাখ্যাটা রাজনৈতিক পরিভাষা এবং শুধুই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের অনুগত করা অনুচিত। কারণ, পবিত্র কুরআন হচ্ছে একটি মজবুত চূড়ান্ত কিতাব। এ কিতাব চিরন্তন, গোটা মানবতার জন্যে ব্যাপক। এর ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে খুশী করা, তাঁর আহকাম বাস্তবায়ন করা, সে মতে আমল করা, আমল করা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুকুম অনুযায়ী। এগুলোর ফলাফল হিসেবে আসবে শাসন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। রাষ্ট্র কিংবা রাজনৈতিক ক্ষমতাই প্রথম লক্ষ্য বা ভিত্তি নয়; বরং প্রথম লক্ষ্য বা ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর আনুগত্য।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সুসংবাদ ও গুরুত্ব বাড়ে আল্লাহর জমিতে আল্লাহর দীনের মজবুতী এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আর তরবিয়তের উল্লেখিত ধারণায় তা অনেক সময় বিলম্বিত হয়ে যায়।

একটু বিলম্বিত হলেও অসুবিধা নেই। কিন্তু তা তুলনামূলকভাবে আরো মজবুত, আরো দৃঢ় হবে। কারণ, অনেক জিনিস যথাসময়ে আসলেই পরে তা মজবুত হয়, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং আল্লাহর দীনের মজবুতির জন্যেও প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কিছু জিনিসের প্রয়োজন। আর তা হতে পারে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য, তাঁর নির্দেশাবলী পালন, দুনিয়ার সব কিছুর ওপর তাঁর আদেশকে অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমে...এবং পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক প্রমাণিত মূলনীতিসমূহের যথাযথ অনুবর্তী হওয়ার মাধ্যমে।

আলোচিত এ পদ্ধতিটিকে কি আমরা 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর অনুসৃত পদ্ধতির নিকটতম পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি? তারাও তো উম্মাহর ইসলামী দীক্ষা বা তরবিয়ত আন্দোলন পরিবর্তনের পদ্ধতির মতো করতে চায়।

–হ্যাঁ, তাদের প্রতি আমাদের মূল্যায়ন অনেক পূর্বের। আমি তাদের সাথে শতভাগ একমত, এ কথা বলছি না। তবে আমি তাদেরকে খুবই সম্মান করি, মূল্যায়ন করি। আমি 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'কে জেনেছি। ইমাম হাসানুল বান্না রচিত 'মুজাক্কিরাতুদ্দাওয়াহ ওয়াদ্দায়িয়া' শীর্ষক গ্রন্থের শুরুতে আমার একটি ভূমিকা রয়েছে। 'ইখওয়ান'-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্নার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আমার হয়নি। তবে মিসরস্থ তাঁর সঙ্গী-সাথী ও শিষ্যদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে। এক সঙ্গে থেকেছিও বেশ কিছুদিন। আমি যা পড়েছি এবং যা জেনেছি....তার আলোকেই আমি আমার 'উরীদু আন আতাহাদ্দাসা ইলাল ইখওয়ান' শীর্ষক বইটি লিখেছি। এতে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমি বেশ কিছু প্রস্তাব রেখেছি। এগুলো ছিল ভাইদের প্রতি এক ভাইয়ের প্রস্তাব, বন্ধুদের প্রতি এক বন্ধুর প্রস্তাব।[১]

জাহেলিয়াতের আঁধার চিড়ে এসো ইসলামের পথে

জাহেলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই এক মহাপ্রত্যাবর্তন। পরিবর্তন ও বিপ্লবের ইতিহাসে তা সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মূর্তিপূজার যাবতীয় অনুষঙ্গকে পিছনে ফেলে দীনে তাওহীদের দিকে যে দূরত্ব মাড়িয়ে দিয়েছিলো তা-ই মানবতার ইতিহাসে স্বল্প সময়ে অতিক্রান্ত দীর্ঘতম দূরত্ব।

এ বিস্ময়কর দীর্ঘ সফরের কাহিনীও চমৎকার, মজাদার। এ কাহিনীর রহস্য জানার জন্যে আজ সারা বিশ্ব ব্যাকুল হয়ে আছে। বিশেষতঃ আজকের এমন অস্থির বিচলিত যুগসন্ধিক্ষণে, যেখানে বিশ্বের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে ঠিকই, চলছে তো

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া ঃ ১৩৩৮ নং সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

চলছেই....তবে জানে না সে গন্তব্য কোথায় তার। কোথায় বা গিয়ে থামবে এ বিশ্ব কাফেলা। তাই এসো, জাহেলিয়াতের আঁধার চিড়ে এসো ইসলামের পথে, আলোয় আলোয় ভরা কুরআনের পথে।[১]

মুসলিম বিশ্বের সংকট

আমি নিশ্চিত মনে করি, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ সংকট হচ্ছে নেতৃবৃন্দ ও জনগণের মধ্যকার বিরাজিত সংকট। এ সংকট তাদের উভয় শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্ট ভয়াবহ দূরত্বগত সংকট। জনগণ ইসলাম পছন্দ করে, ইসলামের জন্যে বাঁচতে চায় এবং ইসলাম নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে, জনগণের নেতৃত্বের বাগডোর যাদের হাতে তারা এসব চিন্তা-চেতনা থেকে অনেক দূরে।[২]

ভয়াবহ শূন্যতা এবং দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত সেই বিচক্ষণ ব্যক্তি

মুসলিম বিশ্বে আজ এক ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করছে। এ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের অভাবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে আজ এমন বিরলপ্রজ বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন যে ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে অমিত সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়াবে, পাশ্চাত্যমুখী সভ্যতার বিভিন্ন মতবাদ ও পদ্ধতি এবং ভাল-মন্দের মাঝে নিজের জন্যে এক বিশেষ রাস্তা বের করবে। এমন রাহ্ বা এমন পথ আবিষ্কার করবে, যে পথে চলে সে কারো অন্ধ অনুকরণ করবে না, কোনো ধরনের গোঁড়ামী ও চরমপন্থা দেখাবে না, যাবতীয় বহিরাঙের ও চোখ ধাঁধানো দৃশ্যের ব্যাপারে দুর্বিনীত থাকবে, অগ্রাহ্য করবে সকল অন্তসারশূন্য বোধ-বিশ্বাস। পক্ষান্তরে সে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে বাস্তবতা ও শক্তির যাবতীয় উপাদানকে। যে কোন কিছুর খোলসকে উপেক্ষা করে ভিতরের মূল বস্তুটাকেই গুরুত্ব দিবে বেশি।

আজ এমন বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, যে নিজের জন্যে, নিজের দেশের জন্যে...এমন কি নিজের জাতির জন্যে আবিষ্কার করে নিবে এক নতুন রাহ্ যেখানে সে সমন্বয় ঘটাবে নবী-রাসূলদের মত বিশেষ ঈমানী বল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) আনীত সত্য দীনের মাঝে, যে দীন দিয়ে আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর জাতিকে সম্মানিত করেছেন। পাশাপাশি সে জ্ঞান-বিজ্ঞানও আয়ত্ব করবে। কারণ এ জ্ঞান ও বিজ্ঞান কোন নির্দিষ্ট জাতির মালিকানা নয়, কিংবা কোন দেশ অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষায়িত কিছু নয়। সে দীন থেকে গ্রহণ করবে

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'মিনাল জাহিলিয়াহ ইলাল-ইসলাম' শীর্ষক পুস্তিকা হতে উৎকলিত, পৃ: ১।

২. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া ঃ ৯ জিলকাদ ১৪১৭ হিজরী প্রকাশিত সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভী (র)-এর একান্ত সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

কল্যাণকর আবেগ-উচ্ছ্বাস। কারণ, মানবতার সেবা এবং সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের আবেগ-উচ্ছ্বাস সব চেয়ে বড় শক্তি ও সব চেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে কাজ দেয়। নির্ভেজাল আসমানী দীন ও সুস্থ দীনী তরবিয়ত হতে উৎসারিত কাঙ্ক্ষিত সঠিক লক্ষ্যও তাই অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীর্ঘ যাত্রা এবং এ ক্ষেত্রে অব্যাহত সাধনা-সংগ্রামের পর পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সব শক্তিশালী মিডিয়া, প্রযুক্তি উৎপাদন করেছে তাও সে অবহেলা করবে না। ঈমানের দারিদ্র্য ও দৈন্যের কারণে পাশ্চাত্য কল্যাণকর আবেগ-উচ্ছ্বাস ও যথার্থ লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এসব মিডিয়া প্রযুক্তি দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। বরং তা দুঃখজনকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজ মানবতার দুর্ভাগ্য, সভ্যতার ধ্বংস অথবা নিতান্ত তুচ্ছ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে।

আজ এমন বিচক্ষণ ব্যক্তির দরকার, যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে কারখানার কাঁচামালের মত ব্যবহার করবে, অর্থাৎ পাশ্চাত্যের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, মতবাদ আবিষ্কার ও প্রযুক্তির সাথে তার আচরণ হবে ঠিক কল-কারখানার কাঁচামালের মত। কাঁচামালের মত সেও এখানে তা দিয়ে তৈরি করবে এমন যুগোপযোগী এক শক্তিশালী সভ্যতা, যার ভিত্তি থাকবে একদিকে ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, আল্লাহভীতি, চরিত্র-মাধুর্য ও ঈমানের ওপর, আরেক দিকে শক্তি, উৎপাদন, স্বাচ্ছন্দ্য ও আবিষ্কার-প্রীতির ওপর। যে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, যার বিন্যাস সুসম্পন্ন হয়ে গেছে, যাকে গ্রহণ করলে দোষ-গুণসহ পুরোটাই করা যায়... এমন আচরণ সে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে করবে না। তা তো তার নিকট বিক্ষিপ্ত কিছু অংশের মত। সেখান থেকে প্রয়োজনমত সে চয়ন করবে, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, তার আক্বীদা-বিশ্বাস, তার চরিত্র, মূল্যবোধের আলোকে এবং তার দীন-ধর্ম যে জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, পৃথিবীর প্রতি তার যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সে আলোকেই সে নির্মাণ করবে কাঁচামাল দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত যন্ত্র। স্বজাতি বনী আদমের প্রতি তার বিশেষ আচরণ, পরকালের জন্যে তার বিশেষ প্রচেষ্টা এবং অব্যাহত সংগ্রামের দাবি মতেই সে গড়ে তুলবে সব কিছু। এভাবে করতে থাকবে (পবিত্র কুরআনের ভাষায়) 'যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে দীনের সব কিছু আল্লাহর জন্যে হয়ে যায় (সূরা আল-আনফাল ঃ ৩৯)

বিচক্ষণ ব্যক্তি কাঁচামাল তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত সেই যন্ত্রটি তৈরি করবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের প্রতি ঈমানের ওপর ভিত্তি করে। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সব সময়ের ইমাম, অনুকরণীয় পথ প্রদর্শক, অনুস্মরণীয় মডেল ও প্রিয়তম নেতা। সুতরাং তাঁর আনীত শরীয়তের আনুগত্য হতে হবে গোটা জীবনের সংবিধান হিসেবে, যাবতীয় আইন-কানুন রচনার ভিত্তি হিসেবে এবং পৃথিবীর একমাত্র দীন তথা জীবন ব্যবস্থারূপে যা দিয়ে ইহ-পরকালের সৌভাগ্য অর্জন করা

যায়। তাই সেই সভ্যতার যন্ত্রটি তৈরি হতে হবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত শরীয়তের পূর্ণ আনুগত্যের ভিত্তিতেই। কারণ, তা ছাড়া আর কোন দীন বা জীবন-ব্যবস্থাই কবুল হবে না মহান আল্লাহর দরবারে।

প্রয়োজন সেই বিরলপ্রজ বিচক্ষণ ব্যক্তির, যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে তার জাতি ও দেশের জন্য যা কিছু দরকার, সব গ্রহণ করবে। কর্মক্ষেত্রে যা কিছু উপকারী এবং যার ওপর পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্যের ছাপ নেই... এমন সব নিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান সে অকপটে নিবে। কারণ, তা তো অভিজ্ঞতা সঞ্চিত প্র্যাকটিকেল জ্ঞান। তবে অন্ধকার যুগ এবং ধর্মদ্রোহী যুগের কোন কিছু এসবের গায়ে লেগে থাকলে তা ধুলোবালির মত ঝেড়ে ফেলে দিবে। মানসিক অস্থিরতা ও স্নায়ুবিক জটিলতা সৃষ্টি করে এমন কোন উপাদান সে কখনই প্রশ্রয় দিবে না এক্ষেত্রে। সে কেবল উপাদেয় জ্ঞানই গ্রহণ করবে, যার মধ্যে বে-দীন ও দীনের শত্রুতার কোন রূহ থাকবে না, এমন জ্ঞান যার ফলাফল কখনো ভুল প্রমাণিত হয় না। উপরন্তু গৃহীত এ জ্ঞান-বিজ্ঞানে সে বিশ্ব জগতের মহান স্রষ্টা ও পরিচালকের প্রতি ঈমানী প্রাণ সৃষ্টি করবে, এবং তা থেকে এমন সব ফলাফল বের করে আনবে যা মানবতার জন্যে সর্বোচ্চ উপকারী, মহান, গভীরতম ও ব্যাপক সৌভাগ্যের বার্তাবাহী সাব্যস্ত হবে। যে ফলাফল পর্যন্ত হয়ত সেসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য শিক্ষকরাও পৌছতে পারেনি।

সেই দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি পাশ্চাত্যের প্রতি চির অনুকরণীয় ইমামের দৃষ্টিতে তাকাবে না এবং নিজেকেও সে সর্বদা অনুসরণকারী শিষ্য মনে করবে না। বরং পাশ্চাত্যের প্রতি তার দৃষ্টি থাকবে অগ্রগামী বন্ধুর মত, এমন বন্ধু যে জাগতিক বস্তুবাদী কিছু কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সুতরাং যে সব বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা তার থেকে ছুটে গেছে তা সে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে নিবে, বিনিময়ে নবুয়তের যে বিরল ঐশ্বর্য তার কাছে আছে তা সে পাশ্চাত্যকে উদার চিত্তে দান করবে এবং মনে করবে, যদিও সে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার মুখাপেক্ষী; পাশ্চাত্যও তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার মুখাপেক্ষী। বরং পাশ্চাত্য তার থেকে যা শিখবে তা সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে উত্তম, যা সে পাশ্চাত্যের নিকট শিখছে বা শিখবে। সাথে সাথে চেষ্টা করবে-বুদ্ধিমত্তা ও পাশ্চাত্যের ভাল-মন্দের মাঝে এবং জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এমন এক নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করতে, যার উপযোগিতা দেখে পাশ্চাত্যও তা অনুকরণ ও মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। একই সাথে বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান ও সভ্যতার পাঠ-পদ্ধতিসমূহে এমন এক 'স্কুল অব থট' সংযোগ করার জন্য প্রয়াস চালাবে যা সর্বাধিক গুরুত্বারোপ, পঠন-পাঠন ও অনুসরণ-অনুকরণের যোগ্যতা রাখে।

এ সেই বিরল বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব যার অভাব রয়েছে আজ মুসলিম বিশ্বের নেতা-শাসকদের মাঝে। নেতা অনেক আছে, বিচিত্র শাসকেরও অভাব নেই। কিন্তু প্রচণ্ড অভাব রয়েছে এমন কাঙ্ক্ষিত বিচক্ষণ, দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের, যার সামনে অন্যান্য অনুবর্তী নেতা-শাসকদের অতি তুচ্ছ মনে হয়।[১]

বর্তমান যুগে দাওয়াতি কার্যক্রমে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব

আমি যখন আরবি সাহিত্যে অনার্স পাশ করলাম, (স্কুলের সিলেবাসের) মাধ্যমিক পরীক্ষাটায়ও পাশ করার ইচ্ছা জাগল মনে। এ ইচ্ছা তখনকার পরিবেশ-পরিমণ্ডলের বিপরীত কিছু ছিল না। তখন গোটা দেশই ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি সংস্কৃতির অনুকূলে ছিল। সর্বত্র ইংরেজি ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন।

আমাদের শায়খ খলীল ইয়ামানিও যুগোপযোগি ইংরেজি পড়াকে বড়ই মূল্যায়ন করতেন। বাস্তবতা ও সময়ের চাহিদা স্বীকার করে তিনি ইংরেজি চর্চার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তার তামান্না ছিল, ছাত্ররা ইংরেজীকে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বার্থেই গ্রহণ করবে, আধুনিক শিক্ষিতদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে ইসলামী দাওয়াতের একটি মাধ্যম হিসেবে ইংরেজীকে আয়ত্ব করবে। আসলে নিয়ত অনুপাতেই মানুষের কর্মফল নির্ধারিত হয়।

এ সময় অত্যন্ত মনযোগ ও আগ্রহ নিয়ে আমি ইংরেজি পড়ার মধ্যে ডুবে যাই। ম্যাট্রিকে পাঠ্যভুক্ত বইসমূহ কিনে নিলাম। আমাদের মহল্লার জনৈক শিক্ষকের নিকট অংক শেখা আরম্ভ করলাম। ইংরেজি ভাষা শিখতে লাগলাম শিক্ষক ফারুকী সাহেবের নিকট। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে চলে গেলে আমি নিজে নিজেই বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে লাগলাম। অতঃপর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বই-পুস্তক পড়া শুরু করলাম। এর মধ্যে সম্ভবত লেসান্স তথা বি এ অনার্সের বইপত্রও ছিল। সমস্যা হলে অভিধান দেখে সমাধা করে নিতাম।

কিন্তু এ স্তরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা হল না আমার। কারণ, আমার মুহতারামা আম্মাজান (সম্ভবত আমার বড় ভাইয়ের মাধ্যমে) ইংরেজির প্রতি আমার অতিমাত্রায় আসক্তির কথা জেনে গিয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে ঈমান ও গায়রত ভরা কোমল ভাষায় এমন কয়েকটি চিঠি লিখলেন যাতে তাঁর বুলন্দ হিম্মত ও দূরদর্শিতার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। চিঠিগুলোতে দ্ব্যর্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে, দুনিয়ার ওপর দীনকে তিনি কতটুকু প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এছাড়া উচ্চপদের চাকুরি, যশ-খ্যাতি আর্থিক স্বচ্ছলতা ও বিত্তশালীতা যা সাধারণত ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট

১. আল্লামা নদভী (র) প্রণীত 'আস-সিরা' বায়নাল ফিকরাতিল ইসলামিয়াহ ওয়াল ফিকরাতিল গরবিয়াহ' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ২১০-২১২।

ও সরকারি পরীক্ষাসমূহের বদৌলতে অর্জিত হয়ে থাকে–এসবের প্রতি আম্মাজানের ঘৃণা প্রস্ফুটিত হয়েছে তীব্রভাবে অথচ সে যুগে এগুলোর জন্যেই প্রতিযোগিতা চলতো ছাত্রদের মাঝে। এসব বিষয়ে সন্তান মেহনত করলে তা নিয়ে মা-বাবারা গর্ব করতো। তার জন্যে অভিভাবকরা ছেলে-সন্তানদের অভিনন্দন দিত। কারণ, তারা এসব অর্জনকেই চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও মর্যাদা মনে করতো।

আমার আম্মার নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়া ও কান্নাকাটির প্রভাবেই হয়ত অতিরিক্ত ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতি হঠাৎ হৃদয়ে ঘৃণা ও বিরক্তিবোধ হতে লাগল। ইংরেজি পাঠ্যবইসমূহ যাদের কাছ থেকে নিয়েছিলাম, তাদেরকে ফিরিয়ে দিলাম। তবে ইংরেজির প্রতি এই যে অতিমাত্রায় আগ্রহ ও মনযোগ দিয়ে কিছুদিন মেহনত করলাম-যার মধ্যে কোন ভারসাম্যতা বা কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না, তা আমার এতটুকু উপকারে এসেছে যে, আমি অল্প সময়েই বিষয়টি আয়ত্ব করে ফেলেছিলাম। আমার জ্ঞান গবেষণা, লেখালেখি এবং ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি দেশের সফরসমূহে এ ইংরেজি শিক্ষা আমার খুবই কাজে এসেছে। ইংরেজি ভাষার এ দক্ষতার কারণে ইংরেজিতে লেখা ইতিহাস ও বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের বই-পুস্তক আমি অনায়াসে অধ্যয়ন করতে পেরেছি এবং এখনো সেই ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের দ্বারা আমি উপকৃত হচ্ছি।[১]

তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে

আম্মাজানের তরবিয়ত ছিল উল্লেখযোগ্য। আজকের যারা অভিভাবক বা অভিভাবিকা তাদের জন্যে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দিক নির্দেশনা হিসেবে কথাটি বলতে আজ আমার ভাল লাগছে। তরবিয়তের ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই আমি এখানে। আর তা হচ্ছে, শিশুদের দীনি তরবিয়ত, চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শিশুদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর দীনের খিদমতের জন্যে তাওফীক দেন এবং তাদেরকে কবুল করে ধন্য করেন–অর্থাৎ কেউ যদি চান, তার সন্তানটি এমনভাবে গড়ে উঠুক যাতে আল্লাহ পাক তাকে তাঁর দীনের খিদমতের জন্যে তাওফীক দেন এবং তাকে কবুল করে ধন্য করেন, তা হলে তাকে সেই দু'টি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। একটা হচ্ছে, শিশুকে সব ধরনের জুলুম, বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখতে হবে। তাকে এমন সব আচার-আচরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যদ্বারা কারো মন ভাঙে, হৃদয়ে আঘাত লাগে। যাতে তার ভবিষ্যতে কোন

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত 'কী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, খণ্ড : ১ম.; পৃষ্ঠা : ১০০-১০২।

আহত হৃদয়ের আর্তনাদ অথবা কোন মজলুমের বদ দোয়ার প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয়ত খেয়াল রাখতে হবে যাতে শিশুর খাদ্যগুলো হালাল হয়। হারাম কিংবা আত্মসাতের মাল অথবা সন্দেহজনক সম্পদ থেকে যেন তার খাবারে কোন অংশ না থাকে। আল্লাহ তাআলা এ অধম বান্দার জন্য দু'টো জিনিসেরই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মালিকানায় দীর্ঘকাল থেকে কোন এজমালি সম্পদ বা জমি ছিল না যাতে অন্য কারো অধিকার বা হক জড়িত থাকতে পারে। আমার আব্বার উপার্জনের উৎস ছিল খালিস তার ডাক্তারি পেশা। আমাকে সন্দেহজনক সম্পদ থেকেই হেফাজত করেননি শুধু; বরং সব ধরনের বিদআত, কুসংস্কার এবং তখনকার ভারতে বহুল প্রচলিত বিভিন্ন প্রথা-উৎসবের খাবার থেকেও রক্ষা করেছেন।[১]

আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের চূড়ায় আরোহণ করতে হবে আমাদের

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর আরবের ইতিহাসে এক মহান বিপ্লব সাধিত হয়। এ বিপ্লবের ইংগিত পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ইসরা ও মি'রাজের কাহিনীতে স্পষ্টাকারে প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটে উঠেছে। মহান আল্লাহ যে নে'য়ামত দিয়ে আরব জাতিকে ভূষিত করেছেন তা কতই না মহান! যে জাযিরাতুল আরবে তারা এক সময়ে পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত ছিল, তা থেকে আল্লাহ তাদেরকে বের করে এক বিশাল প্রশস্ত জগতে এনে উপস্থিত করেছেন। গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব তাদেরকে দান করেছেন। সীমিত সংকীর্ণ গোত্রীয় জীবনালয় থেকে তাদেরকে বের করে আল্লাহ উপনীত করেছেন এক প্রশস্ত মানবতার দুয়ারে। গোটা মানবতার দায়িত্ব এখন তাদের হাতে ন্যস্ত। তারাই মানবতাকে সঠিক পথের দিশা দেবে। এ মহান অবিশ্বাস্য বিপ্লবের কল্যাণেই আরবরা সহসা বিশ্বকে ডাক লাগিয়ে সত্য উচ্চারণ করতে পেরেছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অমিত সাহসের সাথে তৎকালীন পারস্য সম্রাট ও তার রাজ পরিষদের সদস্যদের চোখে চোখ রেখে বলতে পেরেছেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এ জন্যেই, যাতে আমাদের মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা বান্দার ইবাদত থেকে বের করে আনেন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতার দিকে।'

হ্যাঁ, প্রথম তারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসে বিশাল পৃথিবীর রাজ তোরণে। অতঃপর অন্যান্য জাতিকে তারা বের করে আনে দুনিয়ার সেই সংকীর্ণতা থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রশস্ততায়। গোত্রীয় ও জাতিগত সংকীর্ণতার চেয়েও বড় কোন

১. আল্লামা নদভী (র) রচিত 'কী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, খণ্ড : ১ম পৃষ্ঠা : ৭৩।

সংকীর্ণতা আছে? সর্বমানবিক জীবনের চেয়েও প্রশস্ত দিগন্ত আর হতে পারে? যে জীবনে শুধু তুচ্ছ বস্তু ও ধ্বংসশীল জীবন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলে, যেখানে অনাগত অন্তহীন জীবন, সীমাহীন জগত নিয়ে কোন প্রয়াস পরিচালিত হয় না, সে জীবনের চেয়েও সংকীর্ণ জীবন হতে পারে এ ধরায়?

তারা জাযিরাতুল আরবের সেই সংকীর্ণতার শৃঙ্খল ভেঙে, সেখানকার সংকীর্ণ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে বের হয়ে আসে। বের হয়ে আসে সেই জীবনের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা, সেখানকার নেতৃত্বের জন্যে হানাহানি এবং সেই জীবনের তুচ্ছ সম্পদ, ক্ষয়িষ্ণু ক্ষমতা ও নিকৃষ্ট জীবনপ্রণালীসহ সব ধরনের সংকীর্ণতার নাগপাশ থেকে., বের হয়ে আসে তার আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক, ইলমী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক নতুন দুনিয়ায়। উপচে পড়া দানয়ুব, সৌভাগ্যভরা নীল, সুপেয় ফোরাত, দীর্ঘতর সিন্ধু...তুচ্ছ কিছু ছোট্ট নদী আর ক্ষুদ্র গিরি নালা বৈ কিছু নয় যেখানে। যে দুনিয়ায় আলপ্সো ও বারাঙ্গের অতিকায় পর্বতমালা, লেবাননের গিরিপথ ও হিমালয়ের শৃঙ্গসমূহ শুধুই মনে হয় যেন তা তুচ্ছ কিছু টিলা এবং কতিপয় ছোট্ট প্রাচীর। তুর্কিস্তান, চীন ও ভারতের মত বিশাল বিশাল রাষ্ট্রকেও সেখানে অনুমিত হয় যেন সংকীর্ণ কিছু মহল্লা, ছোট ছোট পাড়া এবং বিশ্ব চরাচরে নেহায়েত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। এ নেতৃত্বের চূড়ায় আরোহণরত ব্যক্তি যখন গোটা পৃথিবীর দিকে তাকায় তখন তা মনে হয় রং-বেরঙের ছোট একটি মানচিত্র। উন্মুক্ত আকাশে উড়ন্ত পাখির মানচিত্রটির উপর দৃষ্টি ফেললে ঠিক যেমন লাগবে। আজকের বৃহৎ বৃহৎ জাতি, যাদের রয়েছে নিজস্ব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি... সবগুলোকে বড় কোন জাতির ছোট ছোট কতিপয় পরিবার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

নতুন সেই বিশাল পৃথিবীর ভিত্তি হচ্ছে একক আক্বীদা, গভীর ঈমান ও শক্তিশালী আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ওপর। এর চেয়ে বিশাল প্রশস্ত আর কোন পৃথিবীর সাথে ইতিহাস পরিচিত নয়। যে সব জাতি-গোষ্ঠী নিয়ে এ পৃথিবী গঠিত হবে তার ইতিহাসের জানামতে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মানব পরিবার, যেখানে গলে মিশে একাকার হয়ে যাবে বিচিত্র সব সংস্কৃতি, বিভিন্ন মেধা-প্রতিভা; সব মিলিয়ে গঠিত হবে এক নতুন সংস্কৃতি। আর সেটাই হচ্ছে ইসলামিক সংস্কৃতি, যা পরিস্ফুট হয়ে আসছে ইসলামের অগনিত মণীষার মাঝে, যে সংস্কৃতি যুগে যুগে ইলম ও আমলের ময়দানে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে ইসলামের নিঃসীম কীর্তিগাঁথার বাঁকে বাঁকে এবং সেই ইসলামী কীর্তিগাঁথা এতই বেশি যে, ইতিহাস তা পরিবেষ্টন করতে পারবে না।

এ বিশ্বের নেতৃত্ব ছিল– এবং তা সব সময় থাকবে-নেতৃত্বের ইতিহাসে সব চেয়ে সম্মানিত, সব চেয়ে শক্তিশালী ও মহান নেতৃত্ব হওয়ার যোগ্যতা। আর এ

মহান নেতৃত্ব দিয়ে আল্লাহ আরবদেরকেই সম্মানিত করেছেন। কারণ, তারা ইসলামী দাওয়াতকে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করেছিলেন, এ দাওয়াতের পথে সব ধরনের বিসর্জন স্বীকার করেছিলেন। ফলে দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে এমন ভালবেসেছে, যার দ্বিতীয় নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না,. জীবনের প্রতিটি বিষয়ে মানুষ তাদের এমন অনুকরণ করেছে, যার উদাহরণ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। সকল ভাষা তাদের ভাষার অনুগত হয়ে গেছে, সকল সংস্কৃতি তাদের সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে গেছে, সকল সভ্যতা তাদের সভ্যতার সামনে নত হয়ে গেছে। আরবদের ভাষাই সভ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত জ্ঞান-গবেষণার একমাত্র ভাষা। এটা সেই পবিত্র ও সর্বজনপ্রিয় ভাষা যাকে দুনিয়ার মানুষ নিজেদের দীর্ঘ লালিত ভাষার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ ভাষার মধ্যেই মানুষ লেখালেখি করেছে এবং তাদের প্রিয়তম বই-পুস্তক প্রণয়ন করেছে। একে তারা এমন যত্ন করে লালন করেছে, যেমন তারা তাদের আদরের সন্তানদের করে থাকে এবং তা চমৎকারভাবে করেছে। ইতিহাস সাক্ষী, সে পবিত্র মহান ভাষায় এমন বড় বড় সাহিত্যিক ও লেখক জন্ম নিয়েছেন যুগে যুগে, যাদের সামনে স্বয়ং আরব বিশ্বে শিক্ষিতদের মাথা পর্যন্ত নত হয়ে যায়, যাদের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করে আরবের বাঘা বাঘা সাহিত্যিক ও সমালোচকরা পর্যন্ত।

আরবদের সভ্যতাই সেই আদর্শ সভ্যতা, যাকে দুনিয়ার মানুষ সম্মান করে, যার অনুসরণ করে মানুষ নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে। তাদের সভ্যতাকেই উলামায়ে দ্বীন অন্যান্য সভ্যতার ওপর অগ্রাধিকার দিতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন, তাদের সভ্যতার বিপরীতে সকল সভ্যতাকে তারা জাহেলি ও 'আজমীর অভিধায়ে অভিষিক্ত করেন এবং শেষোক্ত সভ্যতাসমূহের সকল রীতি-নীতি বর্জনের আহ্বান জানান।

এ পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক নেতৃত্ব দীর্ঘকাল সমাজে বিদ্যমান থাকে অথচ মানুষ সেই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কিংবা তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে কখনো চিন্তাও করে না; সাধারণত যেমন বিজিত জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে ঘটে থাকে যুগ-যুগান্তরে। কারণ, আলোচিত নেতৃত্বের সাথে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্ক বিজিতদের সাথে বিজয়ীর, কিংবা শাসিতের সাথে শাসকের অথবা পরাভূতকারী মালিকের সাথে গোলামের সম্পর্কের মত নয়। বরং তা তো ধর্মপ্রাণ লোকের সাথে ধর্মপ্রাণের সম্পর্ক, ঈমানদারের সাথে ঈমানদারের সম্পর্ক। অধিকন্তু তা অনুসারীর সাথে সেই অনুসরণীয় ব্যক্তির সম্পর্ক যে সত্যকে আগে জেনেছে, দাওয়াতের প্রতি যার ঈমান এবং সে দাওয়াতের পথে যার ত্যাগ-তিতিক্ষা অগ্রবর্তী। সুতরাং এখানে বিদ্রোহের কোন সুযোগ নেই, এখানে বিক্ষোভ কিংবা কৃতঘ্নতার কোন অবকাশ নেই। এখানে তো সমাজের মানুষ তাদের অনুসরণীয়দের শুধু অনুগ্রহই স্বীকার করে, তাদের মুখ থেকে কৃতজ্ঞতা ও দোয়ার শব্দই শুধু উচ্চারিত হয় এবং দু'হাত তুলে তারা বলে,

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মার্জনা করুন, মার্জনা করুন আমাদের সে ভাইদেরও যারা আমাদের পূর্বে ঈমানদার ছিলেন এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন ধরনের ক্লেশ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই তুমি তো অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। (সূরা আল-হাশর ঃ ১০)

এ রকমই ছিল, এ সব বিজিত জাতিগুলো আরবদেরকে বিবেচনা করত জাহেলিয়াত ও পৌত্তলিকতা হতে পরিত্রাণ, মনে করত চিরশান্তির নীড়ে আহ্বানকারী, জান্নাতের পথপ্রদর্শক এবং সাহিত্য ও শিষ্টাচারের শিক্ষক।

এটা সেই আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব, যা মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার ঘোষণা হয়েছিল আল-কুরআনের সূরা আল-ইসরায় মি'রাজের ঘটনার মাধ্যমে। এটা সেই নেতৃত্ব যার প্রতি আরবদেরকে আগ্রহী হতে হবে সবচে' বেশি, একে আঁকড়ে ধরতে হবে। তাদেরকে, তাদের সমস্ত মেধা-বুদ্ধি দিয়ে সেই নেতৃত্বের দিকেই ছুটতে হবে। এমনকি আরব পিতা-মাতাদের উচিত তাদের সন্তান-সন্ততিদের অছিয়ত করা, যাতে তারা এ নেতৃত্বকে সারা জীবন আঁকড়ে ধরে। এ নেতৃত্ব থেকে বিচ্যুতি তাদের জন্যে কখনো জায়েয নেই, আত্মমর্যাদাবোধ, ধর্ম ও বিবেক সবদিক দিয়েই এই বিচ্যুতি অবৈধ। এর মধ্যে সকল নেতৃত্বের বদল বা প্রতিকার আছে; বরং কিছু অতিরিক্ত রয়েছে। কিন্তু একে বাদ দিয়ে অন্যান্য নেতৃত্বে এর কোন প্রতিকার নেই, অন্য কিছুতে কোনই যথেষ্টতা নেই। ওটা সেই ব্যাপক নেতৃত্ব যার মধ্যে সকল প্রকার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সন্নিহিত আছে। এ নেতৃত্ব শরীর ও বাহ্যিক কাঠামোর চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব স্থাপন করে মানুষের অন্তরে, হৃদয়-কন্দরে।

এ নেতৃত্বের পথ-পরিক্রমা আরবদের জন্যে সহজ ও মসৃণ করে দেয়া হয়েছে। এটা সেই পথ যাকে মাড়ানোর অভিজ্ঞতা হাসিল করেছে আরবরাই তাদের প্রথম যুগে। আর তা একনিষ্ঠভাবে ইসলামী দাওয়াতের মাধ্যমে, সেই দাওয়াতকে বরণ ও আপন করে নেয়ার মাধ্যমে, সেই দাওয়াতের পথে ত্যাগ-বিসর্জনের মাধ্যমে এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থাসমূহের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে।

এভাবে সেই নেতৃত্ব গ্রহণের ফলে আরবদের অনুগত হয়ে গেল বিশ্বের গোটা মুসলিম উম্মাহ। এ ব্যাপক আনুগত্য হয়ত তাদের ইচ্ছাতেই ছিল না। শুধু কি তাই, তাদের প্রতি ভালবাসা, তাদের সম্মাননা এবং তাদের অনুকরণের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত সারা দুনিয়ার মুসলিম জাতি। এভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সর্বত্র আরবদের সামনে উন্মোচিত হয় সম্ভাবনার নতুন নতুন দ্বার, কাজের নতুন নতুন ময়দান। এমন সব ময়দান, যা আবাদ করা পাশ্চাত্য যোদ্ধাদের, পশ্চিমা

সাম্রাজ্যবাদীদের জন্যে অসাধ্য ছিল। যা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তা-ই অনায়াসে করতলগত হয়ে গেল আরব মুসলমানদের। ফলশ্রুতিতে আসতে থাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নতুন নতুন জাতি, একের পর এক দাখিল হতে থাকে মেধা-শক্তি-ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে চির যৌবনা সব জাতি। এমন জাতিও রয়েছে, তারা যদি নতুন একটি ঈমান পায়, যদি সন্ধান পায় নতুন একটি দীনের, নতুন একটি রূহ এবং নতুন একটি রেসালাতের; তা হলে তারা ইউরোপ, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার মোকাবেলা করার জন্যেও প্রস্তুত আছে।

হে আরব জাতি, তোমাদের দুর্দান্ত শক্তিসমূহ, যদ্দ্বারা তোমরা প্রাচীন বিশ্বকে জয় করেছিলে, আর কত দিন তোমরা তা সীমিত সংকীর্ণ মাঠে ব্যয় করতে থাকবে? বাঁধভাঙা স্রোত অতীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মানবরচিত কত সরকার ও সভ্যতা। তা আর কতকাল আবদ্ধ হয়ে থাকবে এ সংকীর্ণ উপত্যকার সীমিত পরিসরে যেখানে স্রোতের ঢেউগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে ধ্বংস হয়, একে অপরকে ঘায়েল করে করে অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যায়! আবার দায়িত্ব গ্রহণ কর এ বিশাল মানব বিশ্বের, যার নেতৃত্বের জন্যে আল্লাহ তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন, যাকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যে তোমাদেরকে বাছাই করেছেন। আর তোমাদের জাতীয় ইতিহাসে নয় শুধু; বরং গোটা বিশ্ব ইতিহাসে এ নতুন যুগ সূচিত হয়েছিল একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। তোমাদের পরিণতি এবং গোটা বিশ্বের পরিণতি আবর্তিত হয় সেই স্বর্ণালী যুগের সুচিশুভ্র আলোকে। অতএব হে আরব, এ ইসলামী দাওয়াতকে আবার নতুনভাবে গ্রহণ কর, সেই দাওয়াতের পথে সবকিছু কুরবান করে দাও এবং সে পথেই পরিচালিত হোক তোমাদের সংগ্রাম। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন ঃ

'আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলের জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব, তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।' (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৮)[১]

সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা

সাইয়েদ নদভী বলেন, দ্বীন প্রচারকদের উচিত প্রথমেই সাহিত্য চর্চা করা। এতে তার মধ্যে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, যাতে করে সে অভিনব পদ্ধতিতে

১. আল্লামা নদভী (র.) বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'মা যা খাছিরাল আলম বিন হিতাতিল মুসলিমীন' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৯৯-৩০২।

যুগোপযোগী লেখনীর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিত নতুন প্রজন্মের নিকট দীনের দাওয়াত পৌছাতে সক্ষম হবে। ধর্মীয় মহলে এ বিষয়টির বড় অভাব। এর ফলে যখন তারা দীনী কোন বিষয়ের ওপর ফিচার লেখে তাতে না থাকে কোন প্রভাব শক্তি, না থাকে কোন আকর্ষণ। তাই নতুন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে তারা ব্যর্থ হয়। দীনের দা'ঈরা দীনের শিক্ষা অর্জনের পর সাহিত্য শিখলে তাতে জনসাধারণের ওপর যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব পড়বে। এতে যথেষ্ট উপকারও হবে। তবে এক্ষেত্রে লেখকের লেখায় নিম্নোক্ত যথার্থতা থাকতে হবে–

অর্থাৎ শ্রোতার ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কাছে বক্তব্য পেশ করতে হবে।

সাহিত্য, দাওয়াত ও দীন এই তিনটির মধ্যে সম্পর্ক কায়েম থাকা প্রয়োজন। শায়খ আবদুল কাদের জিলানী, আল্লামা ইবনে জাওযীর মত আত্মসংশোধনকারী অলী আল্লাহগণও সাহিত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের উস্তাদগণের অনেকে আদব পড়েছেন তথা সাহিত্যচর্চা করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[১]

আজ আমরা হতাশা ও বিস্ময়ের সম্মুখীন

এক আলোচনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লামা নদভী বলেন, শিক্ষার প্রসার যত বেশী হচ্ছে, মানুষের দৃষ্টিও তত খুলে যাচ্ছে এবং সবাই শান্তির পরিবর্তে হতাশা ও বিস্ময় এবং আনন্দের পরিবর্তে দুঃখ ও নিরানন্দ প্রত্যক্ষ করছে। আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে তা হলে কাঁদতে বেশী, হাসতে কম।'

একটু চিন্তা করুন, যদি কোন এক দুর্বল বৃদ্ধের সুস্থ ও সুঠাম দেহের যুবক সন্তান থাকে, নাতি-পুতি ইত্যাদি থাকে তা হলে লোকে তাকে দেখে কেমন ঈর্ষা করবে? বলবে, কী সৌভাগ্য তার! আল্লাহ তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় দিয়েছেন। সে ব্যক্তি নিজেও আত্মতৃপ্তি লাভ করবে, কারণ সে যে বাগান লাগিয়েছে তা আজ ফুলে ফলে সুশোভিত।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি তখনই প্রচণ্ড আঘাত পাবে, যখন দেখবে তার অন্তিমকালে তাকে এক ফোটা পানি এগিয়ে দেওয়ার মত কাউকে কাছে দেখবে না। আজ আমাদের অবস্থা বৃদ্ধের এই সন্তানদের মত। ইসলাম আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আফসোস করে বলছে–এত লোকের (আলেমের) মধ্যে যদি সামান্য কয়েকজনও কাজের হত, তা হলে সেই অল্প সংখ্যকই না কত ভাল ছিল!

ইসলাম বলছে, সবাই আমার নামে মানুষকে আহ্বান করছে। কিন্তু তাদের কাজ একনিষ্ঠভাবে, ইসলামের জন্য সামান্যই হচ্ছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে,

১. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান রচিত 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)- জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।

মানুষের ভবিষ্যতের বিষয় অজানা এবং তাদের দোষ সম্পূর্ণ গোপন। মানুষ যদি অন্তর্দৃষ্টি পেত তা হলে চোখ দেখতে পেতো যে, পৃথিবীটা দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা, কলুষতা আর পাপ-পঙ্কিলতায় ভরে গেছে। সবাই জাঁকজমক ও ঝলমলে পোশাক পরে হিংস্র পশুর ন্যায় বিচরণ করছে।[১]

বুযুর্গানে দ্বীনের সোহবতের কোন বিকল্প নেই

বুযুর্গদের সোহবত বা সৎলোকের সংশ্রবের কোন বিকল্প নেই। যদি এর কোন বিকল্প থাকতো তা হলে রাসূলের সাহাবীদের (সাহচর্যপ্রাপ্তদের) সাহাবী বলা হত না-আউলিয়া, সুফী বা অন্য কোন পদবীতে তাদের ভূষিত করা হত। তাবেয়ীদের অনেকে যিকির, তাসবীহ ও নফল ইবাদতে খুব অগ্রগামী হয়েছিলেন, কিন্তু তারা মর্যাদায় সাহাবীদের সমতায় পৌছতে পারেননি। সোহবতের দ্বারা কয়েক মুহূর্তে যে কাজ হয়, তা প্রখর মেধা, একনিষ্ঠ অধ্যয়নেও হয় না।

সোহবতে হৃদয়ে আকুলতা-ব্যকুলতা সৃষ্টি হয়, অন্তর নূরে উদ্ভাসিত হয়, সবকিছুতে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এ দ্বারা কোন জিনিসের গুরুত্ব, মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যা কিতাবপত্রেও পাওয়া যায় না, বিদ্যার্জনের মাধ্যমেও আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এটা যেন একটা প্রদীপ। প্রদীপ থেকে প্রদীপে যেমন আলো সঞ্চালিত হয়, তেমনি হৃদয় থেকে হৃদয়ে আলোর গতি সঞ্চালন হয়।[২]

আল্লাহওয়ালাদের নিকট উপস্থিত থাকার লাভ

এক প্রশ্নের জবাবে আল্লামা নদভী বলেন, বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে মানুষ নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে শেখে এবং অনুশোচনার সুযোগ পায়, বুযুর্গদের দরবারে গিয়ে নিজেদের অবস্থা দেখে লজ্জিত হয়। তাদের চরিত্র মাধুর্য, ইবাদত, রূহানিয়াত দেখে নিজেদের দোষ-ত্রুটি ও ঘাটতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এও বলেন যে, নেক লোকের সাহচর্যে থাকার বিষয়টি তো সরাসরি ওহীর দ্বারা প্রমাণিত।[৩]

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব

একজন মুসলমান, সে যেখানেই থাকুক না কেন; তার কর্তব্য হচ্ছে সে নিজেকে স্বীয় সমাজের একজন দায়িত্বশীল হিসেবেই মনে করবে। বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখবে না, দেখেও না দেখার ভান করবে না।

১. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান রচিত 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬১।
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৫।
৩. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান রচিত 'আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২৬৬।

উটপাখি যেভাবে মরুভূমির বালির ভিতর মাথা গুজে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়, মুসলমান সেরকম সমাজে অন্ধ সাজতে পারে না। 'সবকিছু চলবে কাঙ্ক্ষিতভাবেই'-এ ধরনের অলস বাক্য আউড়িয়ে কর্মবিমুখ হতে পারে না মুসলমান। যেখানেই থাকুক মুসলমান, তাকে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ করতে হবে, প্রয়োজনীয় ইসলাহ-সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে হবে, ফিৎনা-ফ্যাসাদ মিটাতে হবে। নিজেকে এমন এক জীবন-তরীর আরোহী মনে করতে হবে; যা ডুবলে সবাইকে নিয়েই ডুববে, সবার সলীল সমাধি ঘটবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) যে উদাহরণ পেশ করেছেন তার চেয়ে সুন্দর ও চমৎকার আর হতে পারে না। আমি তো পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা দর্শনের শিক্ষা ও শিষ্টাচারে এ ধরনের কোনো নজীর খুঁজে পাইনি। হযরত নুমান ইবন বশীর (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখায় যারা কায়েম থাকে আর যারা সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করে–তাদের উদাহরণ সে জাতির মতই যাদের সবাই একটি পানির জাহাজে সওয়ার হয়েছে। কিছু লোক তো জাহাজের ওপর তলায় সওয়ার হয়েছে, আর কিছু লোক নীচের তলায়। নীচের তলায় যারা রয়েছে তাদের পানির প্রয়োজন হলে কষ্ট করে ওপরে গিয়ে, ওপর তলার আরোহীদের ডিঙ্গিয়ে পানি আনতে হয়। ফলে নীচের তলার আরোহীরা বললো, আমরা যদি উপরওয়ালাদের কষ্ট না দিয়ে আমাদের অংশে তথা নীচের তলায় একটি ছিদ্র করে পানির ব্যবস্থা করে নিই, তাহলে মনে হয় ভাল হয়। এখন ওপর তলার লোকেরা যদি নিচের তলার লোকদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয়, তাদের ইচ্ছা মতো জাহাজের তলায় ছিদ্র করতে সুযোগ করে দেয় তা হলে, তাদের জাহাজে পানি ঢুকে সমস্ত আরোহীই মরে হালাক হবে নির্ঘাত। আর যদি ওপর তলার লোকেরা নীচের তলার লোকদের বুঝিয়ে শুনিয়ে এহেন আত্মঘাতী কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে, তা হলে ওপরে নীচের সবাই বেঁচে যাবে নিশ্চয়ই।' (বুখারী, কিতাবুশ শিরকাহ)[১]

ইসলাম যে কত বড় নেয়ামত! তার মূল্যায়ন করতে হবে আমাদের

এক উপলক্ষ্যে আমি বেশ কিছু অতীত ঘটনা উল্লেখ করেছি। আল্লাহর এঁটে দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। নিন্দা জানিয়েছি ওদের যারা ঈমানের নেয়ামতকে, ইসলামের সম্পর্ককে, মুসলমানদের অধিকারকে বেমালুম ভুলে যায়, ভুলে যায় আত্মসম্মান, নিজের ইজ্জত-আব্রু, নিজের জান-মালের সম্মান। যারা কোনো আওয়াজ শুনলেই সেদিকে হয়ে যায়, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো যে কোনো স্লোগানের পিছনে ছুটে যায়, যে কোনো আন্দোলন ও আহ্বানে সাড়া

১. আল্লামা নদভী (র.) রচিত 'কী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, খণ্ড ঃ ১ম পৃষ্ঠা ঃ ৩৩৮-৩৩৯।

দেয়, এ ধরনের লোকদের ধিক্কার জানিয়েছি আমি। এ ধরনের মানসিকতা দীনের জন্যে, গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে যে কত ক্ষতিকর তা খুলে খুলে ব্যাখ্যা করেছি। সুতরাং যা-ই কিছু বিবেককে পরাভূত করে, মন-মানসকে প্রতারিত করে, বশীভূত আবেগ-অনুভূতিকে প্রশমিত করে, তা দেখে তাৎক্ষণিক মুগ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। এটা এক ধরনের ব্যাধি। এসব ব্যাধি ও ঘটনার সাথে সাযুজ্য রাখে এ ধরনের বনী ইসরাঈলের কিছু কিছু কাহিনী সবার সামনে উল্লেখ করেছি আমি। কঠোর সমালোচনা করেছি ভাষা, বংশ ও আঞ্চলিকতাগত বিভিন্ন টাইপের নব্য জাহিলিয়্যাতের, যা অনেক সময় কুফর, জুলুম, অহেতুক বাড়াবাড়ি, রক্তপাত, এমনকি নিরীহ মুসলমান হত্যার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ সব কিছুর উর্ধ্বে ইসলাম। এ ইসলাম যে কত বড় নেয়ামত! তার মূল্য বুঝতে হবে আমাদের এবং তার জন্যে শুকরিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহর দরবারে।[১]

দীনি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে বলছি

এ কথা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম কর যে, এখানে তোমরা কী জন্য এসেছ? কোন প্রাপ্তির আশায় জড়ো হয়েছো? শিক্ষা জীবনের শুরুতেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে বদ্ধমূল কর এবং চিন্তা ও চেতনাকে জাগ্রত কর।

এই দীনি মাদ্রাসায় তোমরা স্বেচ্ছায় এসেছো না অনিচ্ছায়, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের খালিক ও স্রষ্টার মাঝে রয়েছে এক 'স্বর্ণ-শৃঙ্খল', যার এক প্রান্ত তোমাদের হাতে, অন্য প্রান্ত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কুদরতি কবজায়। অর্থাৎ তোমাদের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে এমন এক নূরানী সম্পর্ক কায়েম হয়েছে, যার বদৌলতে তোমরা তার পাক কালাম বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারো, এমনকি আল্লাহর সঙ্গে কালাম করার তরীকাও জানতে পারো।

সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে, মাদ্রাসার পরিচয় কী এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কোন মাদ্রাসার এ পরিচয় আমি মেনে নিতে রাজী নই যে, এখানে আরবী ভাষা শেখানো হয়, যাতে আরবী কিতাব পড়া যায় কিংবা দুনিয়ার কোন ফায়দা হাসিল করা যায়। এটা কোন দীনি মাদ্রাসার পরিচয় হতে পারে না। মাদ্রাসা তো সেই পবিত্র স্থান যেখানে-আগেও আমি বলেছি-তালিবে ইলমের মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে একটি প্রত্যক্ষ ও সুদৃঢ় সংযোগসূত্র সৃষ্টি হয়, যার একপ্রান্ত এদিকে, অন্য প্রান্ত স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতি হাতে।

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম, ভালো করে বুঝে নাও যে, এ মহান নেয়ামতের উপযুক্ত হতে হলে কী কী গুণ অর্জন করা এবং ন্যূনতম কোন কোন চাহিদা পূরণ করা দরকার?

১. প্রাগুক্ত, খণ্ড ২য় পৃষ্ঠা ঃ ৪২।

প্রথমত নিজের মাঝে শোকর ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি সৃষ্টি করো। নির্জনে আত্মসমাহিত হয়ে চিন্তা করো যে, আল্লাহ তোমাকে নবীওয়ালা পথে এনেছেন। এখন তুমি যদি আগের অন্ধকারে ফিরে যাও কিংবা এখানে থেকেও আলো গ্রহণে ব্যর্থ হও, তা হলে এ তোমার দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলো?

এ পথে তুমি প্রিয় নবীর পুণ্য পদচিহ্ন দেখতে পাবে এবং ইলমে নবুওয়তের আলো ও নূরের অধিকারী হবে। সবচে' বড় কথা, এ পথে তুমি তোমার আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।

দ্বিতীয়ত নিজেকে যথাসাধ্য মাদ্রাসার পরিবেশ মতে গড়ে তোলার চেষ্টা করো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব কিছু চাহিদা আছে এবং প্রতিটি পথের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সফলতা লাভের জন্য সেই চাহিদা পূরণ করা এবং সেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করা অপরিহার্য। মাদ্রাসায় এসেও যারা মাহরূম হয় তারা এজন্যই মাহরূম হয়। মাদ্রাসার পরিবেশ থেকে তারা কিছু গ্রহণ করে না, বরং পরিবেশকে দূষিত করে।

তুমি যে দীন শিখতে এসেছো, এ পথের দাবী ও চাহিদা এই যে, ফরয ও ওয়াজিব আমলগুলো পাবন্দির সাথে আদায় করবে। নামাযের প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন পোষণ করবে। জামাতের বেশ আগে মসজিদে এসে নামাযের ইনতিযার করবে। যিকির ও নফল ইবাদতের শওক এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার ও দোআ মোনাজাতের যওক পয়দা করবে।

তৃতীয়ত আখলাক ও চরিত্রকে ইলমের স্বভাব অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করো। ইলমের স্বভাব হলো ছবর ও ধৈর্য, বিনয় ও আত্মবিলোপ, যুহদ ও নির্মোহতা এবং গিনা ও আল্লাহ-নির্ভরতা। সুতরাং এই ভাব ও স্বভাব যত বেশী পারো নিজের মাঝে অর্জন করো। হিংসা ও হাসাদ, অহংকার ও ক্রোধ, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা ইত্যাদি হলো ইলমের বিরোধী স্বভাব। সুতরাং এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো। চতুর্থত তোমার চাল-চলন ও আচার-আচরণ সুন্নাতের পূর্ণ অনুগত করো। এ পথের ইমাম ও রাহবার যারা, তাদেরই মত যেন হয় তোমার বাহ্যিক বেশভূষা।

এ সকল দাবী ও চাহিদা পূরণ করে দেখো দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার মাকাম ও মর্যাদা কোথায় নির্ধারিত হয়? আল্লাহর কসম, তোমাদের সম্পর্কে আমার এ আশংকা নেই যে, দীনি মাদ্রাসা থেকে ফারিগ হয়ে তোমরা অভাব ও দারিদ্র্যের শিকার হবে। আমার ভয় ও আশংকা বরং এই যে, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের বে-কদরীর কারণে বিমুখতা ও বঞ্চনার আযাব না এসে পড়ে।

পক্ষান্তরে তোমরা যদি এ নেয়ামতের যথাযোগ্য কদর করো এবং পূর্ণ শোকর আদায় করো তা হলে প্রতিদানরূপে তোমাদের যোগ্যতা ও প্রাপ্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে। দেখো আল্লাহ কত মজবুতভাবে বলেছেন—

'যদি তোমরা শোকর করো তা হলে অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেবো, আর যদি কৃতঘ্ন হও তাহলে মনে রেখো, আমার আযাব অতি কঠিন।'

আর শোনো, তোমার মাঝে এবং সবার মাঝে আল্লাহ রেখে দিয়েছেন কিছু সুপ্ত প্রতিভা ও ঘুমন্ত যোগ্যতা। ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মাধ্যমে তুমি যদি সেই আত্মপ্রতিভার স্ফুরণ না ঘটাও এবং ইলমী যোগ্যতায় পরিপক্কতা অর্জনে সচেষ্ট না হও তা হলে তুমি কোন 'পদার্থ' বলেই গণ্য হবে না এবং দুনিয়ার কোথাও তোমার কোন সমাদর হবে না। তুমি কোন কাজেরই হবে না।

অবশেষে আবার আমি পরিষ্কার ভাষায় তোমাদের বলতে চাই, শিক্ষা জীবনের শুরুতেই নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝে নাও এবং নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা চিনে নাও। ইলমের সাধনায় আত্মনিমগ্নতা এবং প্রতিভা ও যোগ্যতার বিকাশ সাধনে ঐকান্তিকতা এই যেন হয় তোমার পরিচয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই যেন হয় তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যদিকে চোখ তুলেও তাকিও না। অন্য কিছুতে মন দিয়ে বঞ্চিত হয়ো না। জীবন-কাফেলার বৃদ্ধ মুসাফিরের এ উপদেশ যদি গ্রহণ করো, ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেও সফল হবে, সৌভাগ্য তোমাদের পদচুম্বন করবে। এরপর আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের দরবারে যখন হাযির হবে তখন তোমাদের চেহারা নূরে-ঝলমল হবে। আল্লাহ তোমাদের কামিয়াব করুন। আমীন।[১]

সম্পর্ক, সাধনা ও আল্লাহ-প্রেম

আমি আপনাদের সামনে এমন কিছু কথা তুলে ধরবো যার আলোকে আপনারা জ্ঞান-সাধনা ও কর্ম-সাধনার সুদীর্ঘ জীবন-সফল সুন্দরভাবে শুরু করতে পারেন। সর্বপ্রথম কথা এই যে, জীবনের জন্য এবং হৃদয় ও আত্মার জন্য একজন রাহবার ও পথপ্রদর্শক গ্রহণ করুন। কেননা মোম থেকে মোম আলো গ্রহণ করে এবং প্রদীপ থেকে প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়, এটাই হলো চিরন্তন সত্য। এ জন্য একান্ত কর্তব্য হলো, আল্লাহর যমীনে, যে কোন স্থানে আল্লাহর কোন মুখলিছ বান্দাকে আপনি যদি খুঁজে পান এবং আপনাকে পেতেই হবে তাহলে তাঁকে, আল্লাহর সেই নেক বান্দাকে আপনার রাহমানু ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করুন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন গঠন শুরু করুন। অবশ্য নির্বাচনের পূর্ব স্বাধীনতা আপনার রয়েছে। নির্ধারিত শর্তের আলোকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যেখানে ইচ্ছা গমন করুন। দুনিয়ার যেখানেই তিনি থাকুন, খুঁজে খুঁজে তার দুয়ারে গিয়ে হাজির হোন। আমি তো এতদূর বলতে চাই যে, জীবিতদের মাঝে না পেলে বিগতদের মাঝে তাঁর খোজ

১. আল্লামা নদভী (রঃ) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ২৭-৩০।

করুন। মোটকথা, মাটির ওপরে কিংবা মাটির নীচে যেখানেই আল্লাহর সেই বান্দার সন্ধান পাবেন, তাঁর করতলে নিজেকে অর্পণ করুন এবং তাঁর পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করুন। একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁর জীবন ও চরিত্রের এবং চিন্তা ও কর্মের সবকিছু নিজের দেহ-সত্তায় এবং হৃদয় ও আত্মায় পূর্ণ রূপে ধারণ করুন। অন্তত সাধ্যমত চেষ্টা করুন।

মানুষের সহজাত প্রবণতা এই যে, যাকে সে ভালোবাসে, তাকে সে আদর্শ রূপে অনুকরণ করে। এমনকি নিজেকে তার প্রতিচ্ছবিরূপে গড়ে তোলার সাধনা করে। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এবং হৃদয় ও আত্মার জগতে আপনিও তাই করুন। আমলে, আখলাকে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে পদে পদে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণ করুন এবং নিজের ভিতরে তাঁর পূর্ণ ছবি গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি আপনাকে বলতে চাই তা এই যে, ইতিহাসের যে কোন বরণীয় ব্যক্তির জীবন-চরিত পাঠ করুন এবং তাঁর সফলতা ও কামিয়াবীর নিগূঢ় রহস্য জানার চেষ্টা করুন, আপনার নিজেরই এ স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি হবে যে, তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ও শোভা-সৌন্দর্যের পিছনে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপাদান ছিলো–অন্য কিছু নয় তাঁর নিজস্ব চেষ্টা-সাধনা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁর ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা। এ অমূল্য সম্পদ যদি তোমার না থাকে তা হলে সুবিজ্ঞ ও সুপ্রাজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী তোমাকে গড়ে তোলার যত চেষ্টাই করুন এবং স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তোমার উন্নতির জন্য যত উদ্যোগ আয়োজনই গ্রহণ করুক, ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যের ফাঁকে আটকা পড়া তোমার জীবনের চাকা সচল করে তোলা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

যিনিই গড়ে উঠেছেন এবং আপন কীর্তি ও কর্মে প্রোজ্জ্বল হয়েছেন, নিজের চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের বিরাট বিনিয়োগের মাধ্যমেই হয়েছেন। অলস, কর্মবিমুখ ও নিশ্চিন্ত মানুষের জন্য সাধনার এই পৃথিবীতে কোন স্থান নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর তাওফীক ও মদদই হলো সফলতার প্রথম শর্ত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তো তাদেরই জন্য, যারা মেহনতের পর দোআ করে। তদ্রূপ সামনে চলার পাথেয় রূপে আসাতেযা কেরামের পথনির্দেশও অপরিহার্য, কিন্তু বারুদ ছাড়া বন্দুক যেমন বেকার তেমনি তোমার চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সবাই নিষ্ফল। আল্লাহর তওফীক যদি শামেলে হাল হয়, তা হলে নিজের চেষ্টা-সাধনা দ্বারা মানুষ যা ইচ্ছা তাই হতে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

তৃতীয় ও শেষ যে কথাটি আমি বলতে চাই তা এই যে, মানুষের কর্তব্য হলো, যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা। তোমার জীবন গঠনে এবং জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে প্রকৃতপক্ষে যা কাজে আসবে,

তা হল আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের জযবা ও ব্যাকুলতা। বলা বাহুল্য, আল্লাহর প্রতি প্রেম ও আত্মনিবেদনের প্রাণ ও রূহ যদি মানুষের ভিতর না থাকে, তা হলে মানুষ যত বড় লেখক, সাহিত্যিক ও বাগ্মী হোক না কেন, যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ হোক না কেন, এই মহাসম্পদ থেকে সে মাহরূমই থেকে যাবে।

হতে পারে কিছু দিনের জন্য বিমুগ্ধ মানুষের করতালি ও বাহবা সে পেল এবং কিছু স্তুতি ও সুখ্যাতি ভোগ করলো। কিন্তু এর বেশী কিছু প্রাপ্তি তার কিসমতে নেই। হাকীকতে যে জিনিস তোমার কাজে আসবে, তা হল আল্লাহর ভয়, আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা।

মাওলানা ফযলুর রহমান গাঞ্জমুরাদাবাদী (র.) এক তালিবে ইলমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী পড়ো? সে বললো, (তর্কশাস্ত্রের কিতাব) 'কাযী মুবারক' পড়ি। হযরত মুরাদাবাদী বললেন–

'আসতাগফিরুল্লাহ! এসব পড়ে কী লাভ? ধরো মানতিক পড়ে তুমি কাযী মুবারকের মতই হয়ে গেলে। কিন্তু তারপর কী হবে? কাযী মুবারকের কবর খুলে দেখো, কী তার অবস্থা! আর এমন কোন কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখো যার ইলম তেমন ছিল না, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের দৌলত ছিল, দেখো সেখানে আনওয়ার ও বারাকাতের কেমন ফায়যান ও উচ্ছলতা।

মেনে নিলাম, তুমি বড় মাপের লেখক সাহিত্যিক হয়ে গেলে (যদিও আমি সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-কুশলতার জোরদার সমর্থক এবং দাওয়াতের ময়দানে সাহিত্য থেকে আমি নিজেও বিরাট সেবা গ্রহণ করেছি।) কিন্তু তোমার সাহিত্য-প্রতিভা তখনই স্বার্থক হবে যখন উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি। অন্যথায় তা হবে নফসের বাহন এবং বরবাদীর কারণ। সুতরাং প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টিকেই সবার আগে রাখো এবং এটাকেই মাকছাদে হায়াত রূপে গ্রহণ করো।[১]

আজকের নতুন ফিতনা

দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখো, কত বড় বড় ফিতনা আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। জাহান্নামের আগুন কেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আগুনে পুরো ইসলামী জাহান জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে চলেছে।

সাহাবা কেরামের ত্যাগ ও কুরবানীর ফসলকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন রকমের ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী এবং ঈমান ও আখলাক বিনাশী,

---

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ২৭-৩০।

এমনকি ইনসানিয়াত ও মানবতা বিধ্বংসী ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, এ ধরনের আরো কত বাদ-মতবাদ আজ নবুয়তে মুহাম্মাদীর সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে চায়। সে যুগের মুসায়লামাতুল কাযযাব এ যুগে নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে এবং নবুয়তে মুহাম্মাদীকে চ্যালেঞ্জ করছে।

নবীর রেখে যাওয়া সম্পদের ওপর রাহযানদের প্রকাশ্য হামলা চলছে। নবুয়তের দুর্গে ফাটল সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে। নবুয়তের প্রাণকেন্দ্রে এখন নগ্ন আগ্রাসন শুরু হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অনুসারীরা আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে আমি মনে করি, হয়তো কিছুকালের জন্য ফিকহী ইজতিহাদ মুলতবী রেখে যুগের নতুন ফিতনার মোকাবেলায় তাঁরা সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।

আমার প্রিয় ভাই, তোমরা বড়ই ভাগ্যবান যে, ফিকাহ্ শাস্ত্র সংকলনের দায়িত্ব তোমাদের ওপর আসেনি। মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ আগেই এর ইনতিযাম করেছেন। এ মহা দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য উম্মতকে আল্লামা আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মত ইমাম দান করেছেন। হাদীস শাস্ত্র সংকলনের জন্য ইমাম বুখারী, মুসলিমসহ মুহাদ্দিসীনের জামাত পয়দা করেছেন, আর তারা অসাধারণ যোগ্যতা ও বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে এ মহাকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, যখন মুহূর্ত বিলম্বেরও অবকাশ ছিল না।

তোমাদের বড় সৌভাগ্য! আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। আজ তোমাদের সামনে রয়েছে কাজের নতুন এক ময়দান। ইলহাদ ও নাস্তিকতার সাথে পাঞ্জা লড়ার এবং জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মোকাবেলার সুযোগ এসেছে তোমাদের সামনে। বিশ্বাস করো, যদি তোমরা তা করতে পারো তা হলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ মোবারক তোমাদের প্রতি তেমনি খুশী হবেন, যেমন খুশী হয়েছে পূর্ববর্তী ইমামগণের প্রতি।

ইসলামী জাহানের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি আজ ঐ সকল দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবদ্ধ যাদের রয়েছে সময়ের ডাক এবং যুগের দাবী বোঝার যোগ্যতা, যে সকল দীনি ইদারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষগণ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন তাদের শিক্ষার্থীরা আধুনিক যুগের যে কোন নতুন ফিতনা বুঝতে পারে এবং তার সফল মোকাবেলা করতে পারে।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! একটু ভেবে দেখো, তোমাদের সামনে আজ কর্মের কী বিশাল বিস্তৃত ময়দান পড়ে আছে এবং সামান্য মেহনত-মোজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা আল্লাহর কাছে কী অকল্পনীয় প্রতিদানের হকদার তোমরা হতে পারো!

যামানা এখন নতুন খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং নতুন আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ-এর অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের পাক রূহের ওপর বর্ষিত হোক আল্লাহর

লক্ষ কোটি রহমত। তাঁদের নমুনা তো কেয়ামত পর্যন্ত আর পয়দা হতে পারে না। কিন্তু আমি শুনতে পাই, তাঁদের পাক রূহ যেন তোমাদের ডেকে ডেকে বলছে–'তলোয়ারের জিহাদ তো আমরা করেছি, বুকের রক্ত যত প্রয়োজন ঢেলে দিয়েছি। যখনই ডাক এসেছে ছুটে গিয়েছি, ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি। কিন্তু আজ রক্তের জিহাদের যত প্রয়োজন, চিন্তার জিহাদের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী। ধারালো তলোয়ারের যত প্রয়োজন, শানিত কলমের প্রয়োজন আরো বেশী। বাতিলের বিরুদ্ধে তোমাদের আজ লড়তে হবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে এবং চিন্তা, মতবাদ ও দর্শনের জগতে। কেননা নবুয়তে মুহাম্মাদীর ওপর আজ তলোয়ারের হামলা যতটা চলছে তার চেয়ে বেশী চলছে যুক্তি-প্রমাণের হামলা, চিন্তা ও দর্শনের মামলা। সুতরাং নতুন যুগের নতুন জিহাদের জন্য তোমরা একদল মুজাহিদ তৈরী হও।'[১]

নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি

প্রিয় বন্ধুগণ! শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধনের এবং জীবন-গ্রন্থের নতুন পাঠ গ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বলার কথা তো অনেকই আছে, কিন্তু সবকিছু বিশদভাবে আলোচনার এখন অবকাশ নেই। সুতরাং বিশেষভাবে শুধু একটা কথাই শোন এবং এই কান দিয়ে নয়, বরং দিলের কান দিয়ে শোনো। কেননা, তাতে তোমাদেরই লাভ। কথা এই যে, এত ত্যাগ স্বীকার করে, এত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে যখন এসেছ তখন ভালো হওয়ার এবং উন্নত হওয়ার চেষ্টা করো। জীবনের নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কামিয়াব ও সফল হওয়ার চেষ্টা করো। যদি সম্ভব হতো তা হলে কথার পরিবর্তে আমি আমার দিল-কলিজা বের করে তোমাদের সামনে রেখে দিতাম এবং হৃদয়ের আকুতি ও ব্যাকুলতা তুলে ধরতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কারণ ভাব প্রকাশের জন্য শব্দকেই আল্লাহ মাধ্যম বানিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহর কালাম কুরআনই সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাই হৃদয়ের ভাব ও ভাবনা এবং হৃদয়ের জ্বালা ও যন্ত্রণা শব্দের মাধ্যমেই আমাকে প্রকাশ করতে হবে।

আমাকে যদি তোমরা বলার সুযোগ দাও তা হলে বারবার আমি একথাই বলবো যে, সাধনা ও পরিশ্রম দ্বারা যুগের জন্য, সমাজের জন্য, দীনের জন্য এবং উম্মতের জন্য মূল্যবান থেকে মূল্যবান সম্পদ হওয়ার চেষ্টা করো। বস্তুত উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের এই জযবা ও প্রেরণাই হলো মানুষের স্বভাব ও ফিতরাত। এটা যদি মানুষের মাঝে না থাকে, তা হলে তো সে পশুর পর্যায়ে নেমে আসে। আর এটা আছে বলেই মানুষ পশুর নীচতা থেকে ফেরেশতার উচ্চতায় পৌঁছে যায়, এমনকি ফেরেশতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৮।

প্রিয় বন্ধুগণ! মনে করো এক ব্যক্তি গুপ্তধন পেয়ে গেলো এবং জহুরীকে তা: মূল্য জিজ্ঞাসা করলো। জহুরী দেখে শুনে পরীক্ষা করে বললো–

এ অতি মূল্যবান হীরা। তবে তিনটি শর্ত। প্রথমতঃ এটাকে দক্ষহাতে কাটতে হবে এবং পালিশ করে তাতে ঔজ্জ্বল্য আনতে হবে। অন্যথায় এটা মূল্যহীন পাথর ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বিতীয়তঃ খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হবে। কেননা এটা এত নাযুক যে, সামান্য অসাবধানতায় তাতে সামান্য আঁচড়ও যদি লাগে, তা হলে তা বেকার হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ একবার যদি আঁচড়ে লেগে বেকার হয়ে যায় তা হলে কখনো তার সংশোধন ও সংস্কার সম্ভব নয়।

এখন যুক্তি ও বুদ্ধির দাবি এই যে, যার হাতে এই মূল্যবান হীরা এসেছে সে অবশ্যই পূর্ণ সাবধান ও যত্নবান হবে এবং বাজারের সেরা জহুরীকে দিয়ে চূড়ান্ত সতর্কতার সাথে হীরকখণ্ডকে কাটার ও পালিশ করার ব্যবস্থা করবে। এরপর নিলামের বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আল্লাহর ঘর মসজিদের মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তোমাদের হাতে আছে সেই হীরকখণ্ড। তোমাদের প্রত্যেকে তেমন একেকটি হীরকখণ্ডের অধিকারী। আর তা হলো তোমাদের জীবনের সুপ্ত যোগ্যতা। শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা, আনুগত্যের যোগ্যতা এবং উত্তম থেকে উত্তম হওয়ার যোগ্যতা। মানবের এ সকল সুপ্ত যোগ্যতার কারণেই তো ফেরেশতাগণ তাকে ঈর্ষা করেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই তোমরা ঐ স্তরে উপনীত হতে পারো, যা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে–

'যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি, এমনকি কোন মানব হৃদয়ে যার চিন্তাও উদিত হয়নি।'

এ সকল যোগ্যতার বদৌলতে তোমরা ওলীয়ে কামেল হতে পারো, হতে পারো আল্লাহর প্রিয় বান্দা। যেমন কবি বলেছেন–

'নিগাহে মর্দে মুমিন সে বদল জা'তী হে তক্বদীরে'। অর্থাৎ মরদে মুমিনের এক নযরে বদলে যায় তাকদীর।

তোমরা কী না হতে পারো! তোমরা তো এমন হতে পারো যে, শুধু তোমাদের শহর নয়, বরং পুরা উম্মত ও মিল্লাতের তাকদীর বদলে যেতে পারে তোমাদের উসিলায়। তোমরা তো হতে পারো এমন পরশপাথর, খোদাদ্রোহী নাস্তিকও যদি তোমাদের সংস্পর্শে আসে তা হলে মুহূর্তে সে আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। যে লোকালয়ে তোমরা যাবে সেখানে মানবতার বসন্তের বাহার বয়ে যাবে। সেখানকার

প্রকৃতি ও পরিবেশ পাল্টে যাবে। এই পরশ-ক্রিয়া আজও তোমাদের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে যদি ভিতরের যোগ্যতাকে জাগ্রত করে পূর্ণরূপে ব্যবহার করো। তোমাদের কল্যাণে আল্লাহ জানেন কত বড় বড় জনপদ জান্নাতের পথে আওয়ান হতে পারে! কোন সন্দেহ নেই যে, নবুওয়ত খতম হয়ে গেছে। কিন্তু তোমরা তো পৃথিবীতে 'আল্লাহর নিদর্শন' হতে পারো, হুজ্জাতুল ইসলাম ও শায়খুল ইসলাম হতে পারো। সবচে' বড় কথা, তোমরা ওয়ারিসে নবী ও নায়েবে রাসূল হতে পারো। তবে শর্ত এই যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে; ত্যাগ ও কুরবানীর প্রতিজ্ঞা, সাধনা ও মোজাহাদার প্রতিজ্ঞা এবং আত্মশুদ্ধির প্রতিজ্ঞা। কেননা তোমরা তো এসেছো আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। সুতরাং তোমরা যদি উন্নতি ও পূর্ণতা লাভের এবং কামিয়াব ও সফলতা অর্জনের ফয়সালা করো তা হলে বিশ্ব-জগতের পুরা গায়েবী নেযাম তোমাদের জন্য নিবেদিত হবে। এমনকি সাগরের তলদেশের মাছেরাও তোমাদের জন্য দোআ করবে। হাদীস শরীফের বাণী এর প্রমাণ।

আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, মানব সমাজে এমন হতভাগা কে আছে যে নিজের উন্নতি ও সফলতা চায় না। প্রাণহীন পাথরও তো উন্নতির আহ্বান অস্বীকার করে না। বিশ্ব-জগতের প্রতিটি কণা উন্নতির প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। মাটিতে ফেলে দেয়া একটি বীজ উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে করে এক সময় পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ফলবতী হয়ে উন্নতির চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়।

জগতের উন্নতি জগতেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রিয় বন্ধুগণ! তোমাদের জীবন-সফরের ক্রমোন্নতি মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে। অবশেষে দীদারে ইলাহীর মাধ্যমে তোমাদের আত্মিক উচ্চাভিলাষ পরিতৃপ্তি লাভ করবে এবং সেটাই হবে তোমাদের চিরস্থায়ী মঞ্জিল।

তোমাদের প্রথম কর্তব্য এই যে, পরম সম্ভাবনাময় একটি ক্ষুদ্র বীজ মনে করে নিজেকে 'মাটির সাথে' মিশিয়ে দাও এবং হৃদয়ের গভীরে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পোষণ করো যে, উন্নতির সকল স্তর আমাকে অতিক্রম করতে হবে এবং সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়ে দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্য লাভ করতে হবে। আমাকে ভালো হতেই হবে। পূর্ণতার স্বাদ আমাদের পেতেই হবে। কবি বড় সুন্দর বলেছেন–

'আপনে মন্ মে ডুব কর পা জা সুরাগে জিন্দেগী,
তূ আগর মে'রা নেহী বন্ তা ন বন্ আপনা তো বন্।'

অর্থাৎ আপন হৃদয়-সাগরে ডুব দিয়ে তুমি আত্মসমাহিত হও এবং জীবনের স্বার্থকতা লাভ করো/ তুমি আমার যদি না হবে না হও, নিজের তো হও। নিজেকে কেন নিজের স্বভাবনা থেকে বঞ্চিত করো?[১]

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৮।

আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা

শুরু থেকে আমি ইতিহাসের ছাত্র এবং ইতিহাস অধ্যয়নের পরিমাণ আমার অল্প নয়। আমি পূর্ণ দায়িত্বের সাথে বলতে পারি যে, অন্তত ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সীমানায় এমন কোন বিপ্লব বা সংস্কার আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই, যা শুধু কথার যাদুতে এবং কলমের কারিশমায় সফল হয়েছে।

বর্তমান যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি চিন্তা-দর্শনের দিকে অতি সংক্ষেপে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আল্লামা ইকবাল এই চিন্তা-দর্শন কওম ও মিল্লাতের সামনে পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন–

(এ যুগে) যামানার মুজাদ্দিদ তাকেই বলা যাবে যিনি ইসলামী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এবং জীবনের সঙ্গে তার সংযোগ সাধনে সক্ষম হবেন। সময় ও সমাজকে যিনি এ সত্যের ওপর আশ্বস্ত করতে পারবেন যে, ইসলামের আইন ও শরীয়ত এবং নীতি ও বিধান মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত সকল আইন ও বিধানের চেয়ে উন্নত এবং অগ্রসর। এটা সময় থেকে এত অগ্রবর্তী যে, সময় কখনো তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। দুনিয়া যতই উন্নতি করুক এবং সময় যতই আগে বাড়ুক ইসলামের শরীয়ত ও জীবনবিধান মানুষের সমাজ ও সভ্যতাকে এখনো পথ দেখাতে পারে এবং সকল যুগজিজ্ঞাসার সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে। মানব জীবনের যত রকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে ইসলামী শরীয়তে রয়েছে তার পূর্ণ সমাধান। সবযুগেই তার মাঝে রয়েছে একটি সর্বোত্তম আদর্শ, সমাজ গঠনের সর্বোত্তম যোগ্যতা।

এ চিন্তা-দর্শন আল্লামা ইকবাল জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন এবং তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল যে, এ সত্য তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পত্রযোগে আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.) এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। ইসলামী জাহানের জ্ঞানজ্যোতিষ্ক আল্লামা শিবলী নোমানীর সুযোগ্য উত্তরসূরী আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (র.) ছাড়া এ কাজের যোগ্য আর কে-ই বা হতে পারতেন। এ প্রশ্ন এখনো একইভাবে বরং আরো জোরালোভাবে উম্মাহর সামনে বিদ্যমান এবং সন্তোষজনক জবাবের জন্য অপেক্ষমান। আজকের তালিবানে ইলম যারা, আগামীতে তাদের নামতে হবে ইসলামের আইন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক জিহাদে।

সবচে ভয়ঙ্কর চিন্তা-যুদ্ধ

একইভাবে বর্তমান যুগে ইসলামী বিশ্বে যে চূড়ান্ত ভাগ্যনির্ধারণী লড়াই শুরু হয়েছে তা হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার লড়াই। এ পর্যন্ত বহু মুসলিম দেশ ও জনপদ পাশ্চাত্য সভ্যতার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে অধঃপতনের এমন অতলে গিয়ে পৌঁছেছে যা কল্পনা করলেও আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের আরাম হারাম হয়ে যেতো। সেই একই ধ্বংসের পথে দ্রুত ধাবমান রয়েছে আরো বহু মুসলিম দেশ, কিন্তু আফসোস, আমাদের গাফলতের সুখনিদ্রার তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

যাদের হাতে মুসলিম বিশ্বের শাসন ক্ষমতা, সেই অভিজাত শ্রেণী এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মুসলমানের মাঝে এখন এক ভয়াবহ চিন্তা নৈতিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান। শাসকবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মনে করে উন্নতির চূড়ান্ত স্তর এবং সর্বোন্নত সমাজব্যবস্থা ও জীবন বিধান লাভের সফলতম মানবীয় প্রচেষ্টা, যার পর অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোন পথ নেই। তাদের বিশ্বাস এই যে, পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন হলো ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আধুনিক বিকল্প। কেননা আধুনিক বিশ্বে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা তার সকল কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এখন আর জীবন-মঞ্চে তার ফিরে আসার চিন্তা করাও উচিত নয়। এটাই হলো সেই জ্বলন্ত প্রশ্ন, যার লেলিহান শিখা গোটা ইসলামী জাহানে আজ ছড়িয়ে পড়েছে, যার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে সমাজের কোন শ্রেণী এবং আধুনিক শিক্ষায় 'শিক্ষিত' কোন মানুষ মুক্ত নয়।

সুতরাং আমি মনে করি, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার (এভাবে অন্যান্য সব দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও) প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই সর্বগ্রাসী অগ্নি ঝড়ের মোকাবেলায় ময়দানে নেমে আসা। এটাই হলো আমাদের কাছে মহান পূর্বসূরীদের অবিস্মরণীয় সাধনা ও মুজাহাদা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর দাবি। এটাই হবে সময়ের সবচেয়ে বড় সংস্কারমূলক কাজ, বরং এটাই হতে পারে নদওয়ার (বা সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের) অস্তিত্বের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তার সবচে বড় প্রমাণ। সুতরাং মুসলিম কিংবা অমুসলিম বিশ্বের যেখানে যত নদভী ফুযালা রয়েছেন এবং নদওয়ার চিন্তা ও আদর্শের ধারক বাহক রয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো এ প্রশ্নের এমন সন্তোষজনক জবাব পেশ করা, যা যুগের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করতে পারে। তাদের কর্তব্য হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন-দর্শনের সর্বনাশা স্রোতের মুখে বাঁধার এমন প্রাচীর গড়ে তোলা, যা ডিঙিয়ে কোন ঢেউ উম্মাহকে আঘাত করতে না পারে। এ লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের মাধ্যমেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ত্যাগের ফায়সালা হতে চলেছে এবং কম বেশী প্রতিটি ইসলামী দেশ ও মুসলিম জনপদ এ সর্বনাশা ঝড়-ঝঞ্ঝা কবলিত হয়ে পড়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন ঃ

আমার প্রিয় তালিবানে ইলম!

যুগের এ চ্যালেঞ্জ তোমাদের আজ গ্রহণ করতে হবে এবং এ মানদণ্ডেই বর্তমান শিক্ষাজীবনে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে।

এখন আপনাদেরকে মেধা ও যোগ্যতা এবং প্রতিভা ও প্রজ্ঞার প্রমাণ দিতে হবে। সমাজের সামনে ইলমের এমন সমুচ্চ মান উপস্থাপন করতে হবে যা ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে, তত্ত্ব ও তথ্যের বিচারে এবং ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিচারে, মোটকথা সর্ববিচারে যা হবে অনন্য ও অতুলনীয়, যা দেখে সভ্যতাগর্বী যুগ ও সমাজ অবনত মস্তকে বলতে বাধ্য হবে যে, আপনার সিদ্ধান্তের অকাট্যতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

পিছনের সেই কথা আমি আবার বলবো এবং বারবার বলবো, নতুন যুগ আপনাদের কাছে বহু নতুন কিছু চায়। আমাদের মহান পূর্বসূরীদের কাছে যা চেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী নাযুক ও সংবেদনশীল বিষয় আপনাদের কাছে চায়। আর যুগের ন্যায্য চাহিদা যারা পুরো করে না, তাদের টিকে থাকার কোন অধিকার থাকে না। সময়ের সেই দাবি ও চাহিদা শুনুন আল্লামা ইকবালের কবিতায়–

'নিগাহ বুলন্দ, সখুন দিল নওয়াজ, জাঁ পুর সূঝ,
ইয়ে হি হে রখতে সফর মীরে কারাওয়াঁ কে লিখে।'

অর্থাৎ 'সুউচ্চ দৃষ্টি, সুমিষ্ট ভাষা, আর হৃদয়ের দহন ও উত্তাপ।
হে কাফেলার রাহবার! এ-ই হলো তোমার পাথেয়।'

এখন তো সুমিষ্ট ভাষাও আমাদের দখলে নেই, অথচ ইকবালের দাবি সুমিষ্ট ভাষাই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে চাই দৃষ্টির উচ্চতা, যা দুনিয়ার 'দৃশ্যকে' অতিক্রম করে দেখতে পায় আখেরাতের 'অদৃশ্যকে। আর চাই হৃদয়ের দহন, যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের (এবং মানুষের হৃদয়ের-রাজ্যে অধিকার বিস্তারের) একমাত্র মাধ্যম। এছাড়া যা কিছু সবই মরীচিকা, শুধুই মরীচিকা।[১]

কেন এ হীনমন্যতা, কোথায় আত্মমর্যাদা?

আমার প্রিয় তালেবানে ইলম!

যুগ ও সমাজের মোকাবেলায় কেন ও কী জন্য তোমাদের এই হীনমন্যতা? অন্যদের হীনমন্যতা হলো মানসিক দুর্বলতা ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধি। কিন্তু তোমাদের হীনমন্যতাবোধের অর্থ হবে দীন ও ঈমানের কমজোর এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের দুর্বলতা। এর অর্থ হবে গায়েবী ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং আসমানী নেযাম ও ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা, যার পরিণাম-পরিণতি খুবই গুরুতর ও সুদূরপ্রসারী। নববী ইলমের ধারক ও বাহক যারা, ওয়ারিসে নবী ও নায়েবে রাসূল যারা তাদের মনে যদি বাসা বাঁধে তুচ্ছতা ও হীনমন্যতার অনুভূতি, তা হলে এর অর্থ হবে এই

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী, শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ৮২-৮৫।

যে, নবুওয়তের মাকাম ও মর্যাদা তাদের জানা নেই। আল্লাহর যাত ও সিফাতের পরিচয় তাদের কাছে নেই। অন্তরে ইয়াকীন ও বিশ্বাসের সম্পদ নেই।

ভাই, তোমরা তো এমন সব ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উত্তরসূরি যাদের সামনে এসে থেমে যেত সময়ের গতি, যারা নির্ধারণ করে দিতেন জীবন ও সমাজের রীতি-নীতি, যাদের নূরানিয়াতের সামনে ম্লান হয়ে যেতো সূর্যের দীপ্তি। তোমরা তাদের পদাংক অনুসারী, শেখ সাদীর ভাষায় যারা ছিলেন 'মুকুটহীন সম্রাট'।

যে মহামূল্যবান সম্পদ সম্ভার রয়েছে তোমার কাছে, পৃথিবীর সব রাজভাণ্ডার তা থেকে বঞ্চিত। তোমার সিনায় রয়েছে ইলমে নবুওয়ত ও নূরে নবুওয়ত। তোমরা চিন্তায়, চেতনায় এবং বিশ্বাসে ভাবনায় রয়েছে সেই সব মহাসত্য ও চির রহস্য, যা বহুদিন হলো মানবতার হাতছাড়া হয়ে গেছে। মানবজাতি আজ অন্ধকারে ডুবে আছে। বিভিন্ন গোলযোগ-দুর্যোগ ও ফেতনা-ফাসাদে সবাই এখন দিশাহারা।

কিন্তু তালেবানে ইলম! স্থূল দৃষ্টিতে তাদের পরিচয় হলো জীর্ণ দেহ, শীর্ণ বস্ত্র ও রিক্ত হস্ত, কিন্তু অন্তর্চক্ষু মেলে নিজের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখো। হৃদয়-রাজ্য তোমার কত শত সম্পদে পরিপূর্ণ। যিন্দা কলব, যিন্দা রূহ, সজীব হৃদয়, সজীব প্রাণ।

এত বড় সত্য আর কোন্ কবি কবে কোন্ কবিতায় এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে! শোন–

'বর খুদ নযর কুশা'য তেহী দা'মনে মরঞ্জ
দর সীনায়ে তু তামামে নাহা'দাহ আন্দ।'

অর্থাৎ 'শূন্য আঁচল দেখে ক্ষুণ্ণ হও কেন তুমি?
নিজেকে দেখো একবার, বুকে তোমার লুকিয়ে আছে চাঁদ পূর্ণিমার।'

জেনে রেখো, মনস্তত্ত্বের স্বীকৃত সত্য এই যে, ইজ্জত ও যিল্লতি এবং তুচ্ছতা ও মর্যাদার সম্পর্ক হলো মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে। বাইরের জগতের সাথে তার সম্পর্ক খুবই কম। হীনমন্যতা ও তুচ্ছতাবোধ একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রকাশমাত্র। নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে মানুষের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়-সন্দেহ, দুর্বলতা ও অনাস্থা এবং আত্মপরিচয়ের অভাব-এসবেরই অনিবার্য পরিণতি হলো নিজের তুচ্ছতার অনুভূতি ও হীনমন্যতাবোধ। মানুষ নিজেকে নিজে তুচ্ছভাবে, মূল্যহীন মনে করে। তারপর সন্দেহে পড়ে যায় যে, সময় ও সমাজ বুঝি তাকে তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করছে। অথচ প্রকৃত সত্য এই যে, নিজের ওপর নিজেই সে অবিচার করছে। নিজেই নিজের অবমূল্যায়ন করছে। মনে রাখবে, নিজেকে যে তুচ্ছ ভাবে, নিজের কাছে নিজের মূল্য যে হারিয়ে ফেলে পৃথিবীর কোন পদ ও সম্পদ তাকে মর্যাদা দিতে পারে না, মূল্যবান বানাতে পারে না। আপন হৃদয়ে যার স্থান নেই, এ জগতে সংসারে কোথাও তার স্থান নেই। আপন হৃদয়ের

প্রসার ও সংকোচনেই বাইরের জগত সম্প্রসারিত ও সংকোচিত হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের হৃদয়কে নিজের জন্য সম্প্রসারিত করো, জগত নিজেকে মেলে ধরে তোমাকে স্বাগত জানাবে।

মানুষের কর্তব্য হলো আত্মজিজ্ঞাসা করা, নিজেকে নিজে প্রশ্ন করা–নিজের সঙ্গে নিজে সে কী আচরণ করছে? নিজের হৃদয়ে নিজেকে সে কতটা মর্যাদার আসন দিয়েছে? নিজেকে যদি সে রিক্ত ও নিঃস্ব মনে করে, দুনিয়ার বাজারে নিজেকে যদি তুচ্ছ ও মূল্যহীন ভাবতে থাকে, তা হলে নিক্তির মাপে ওজন করতে অভ্যস্ত এই পৃথিবীর কাছে ইজ্জত ও মর্যাদা আশা করা তার উচিত নয়। জ্ঞানে বিজ্ঞানে এবং আবিষ্কারে– উদ্ভাবনে অতি অগ্রসর এই পৃথিবীতে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও যদি তুমি বুঝতে না পার তা হলে আমার কিছু বলার নেই। আরব জাহেলিয়াতের দাতা হাতেম তাঈ কিন্তু এ পরম সত্য আমারদ তোমার শিক্ষার জন্য তার এক কবিতায় রেখে গেছেন–

'ওয়া নাফসাকা আকরিম হা ফাইন্নাকা ইন তাহুন,
আলাইকা ফালান তালক্বা মিনান্নাসি মুকরিমা।'

অর্থাৎ 'বন্ধু! নিজেকে নিজে মর্যাদা দাও। কেননা তোমার চোখে তুমি তুচ্ছ হলে মানুষের মাহফিলে কোন কদর পাবে না তুমি।'

প্রিয় বন্ধুগণ!

চাঁদ-সূর্যের অস্তিত্বের মতই আমি বিশ্বাস করি যে, শত শত জাতির কোটি কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে আমরা তুচ্ছ নই, নিঃস্ব নই, দুর্বল ও শক্তিহীন নই, অসহায় ও বে-সাহারা নই। কিন্তু সমস্যা এই যে, আমরা আমাদের আত্মপরিচয় ভুলে গেছি। এই আত্মবিস্মৃতিরই পরিণতি হলো আমাদের হীনমন্যতাবোধ।

এ ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা এই যে, আমাদেরকে আত্মসচেতন হতে হবে। নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা অনুধাবন করতে হবে। নিজেদের ভিতরে গচ্ছিত সম্পদের সঠিক খোঁজ নিতে হবে। দুনিয়ার পরিবর্তন আসলে আমাদের দৃষ্টির পরিবর্তন। বাইরের দুনিয়ার সবকিছু আমাদের দৃষ্টির অনুগামী। যেদিন জীবন ও জগত সম্পর্কে এবং নিজেদের সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসবে সেদিন জগত সংসারের সবকিছুতেই পরিবর্তন আসবে এবং আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাব, হীনমন্যতাবোধের যে ভয়ঙ্কর অপচ্ছায়া আমাদের তাড়িয়ে ফিরছিল, তা কর্পূরের মত উবে গেছে। কবি সত্যই বলেছেন–

'অওর আগর বা'খবর আপনি শারাফত সে হু,
তেরী সিপাহ ইনস ও জ্বিন, তু হে আমীরে জুনূদ।'

অর্থাৎ 'আপন মর্যাদা সম্পর্কে তুমি সচেতন হও তাহলে দেখবে, জিন-ইনসান হবে তোমার সিপাহী, আর তুমি হবে আমীরে লশকর।'

আমাদের বিগত ও সমসাময়িক ইতিহাসে দেখা যায়, যারা বিশ্বজগতে নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন, সারা বিশ্বের সবকিছু তাদের কাছে মনে হয়েছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। ফলে দুনিয়ার কোন সালতানাত কখনো তাদের খরিদ করতে পারেনি। প্রতাপশালী সুলতান ও আমীর-উমরাদের বড় বড় লোভনীয় প্রস্তাব মৃদু হেসে এই বলে তারা ফিরিয়ে দিয়েছেন যে, 'ঈগল তো নীড় বাঁধে সর্বোচ্চ বৃক্ষের শীর্ষ চূড়ায়।'

মানবজাতির ইতিহাস যদিও বারবার আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিক্রিত মানুষের কলঙ্ককে কলঙ্কিত হয়েছে, তবু তা এই মহামানবদের ব্যক্তিত্ব বিভায় উদ্ভাসিত এবং তাদের আল্লাহ-প্রেম ও আত্মসম্মানবোধের কাহিনীতে গৌরবান্বিত হয়েছে। মানবতার শির তাদেরই কল্যাণে চির উন্নত রয়েছে যারা কর্মে ও বিশ্বাসে নিজেদের শির উন্নত রেখেছেন।[১]

যুগের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে

প্রিয় বন্ধুগণ!

ওলামায়ে উম্মতের চিন্তা-চেতনা, মেধা-মস্তিষ্ক এবং তাদের খেদমত জযবা কখনো কোন নির্দিষ্ট গণ্ডীতে স্থির থাকেনি এবং কখনো তাঁরা চিন্তা-বন্ধ্যাত্বের শিকার হননি; বরং সব সময় তাঁরা ইলমের চলমান কাফেলায় আগুয়ান ছিলেন। সময় ও সমাজের স্পন্দিত শিরা থেকে তাদের হাত কখনো সরে যায়নি; বরং বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত তার স্পন্দন ও গতি-প্রকৃতি তারা অনুধাবন করেছেন। জীবনের স্বভাব পরিবর্তন এবং সময়ের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে কখনো তাঁরা বে-খবর হননি; বরং তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেছেন। ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর খেদমত ও রাহবারির জন্য সময়ের দাবি হিসাবে যখন যে পথ ও পন্থাকে এবং যে কর্মপদ্ধতিকে তারা কার্যকর ও কল্যাণকর মনে করেছেন নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছেন। তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি, বিশেষ কোন চিন্তা ও পন্থা ও নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ছিলো না।

মিসর ও ভারতবর্ষে যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সাহিত্যের পথে ইসলামের ওপর হামলা শুরু হলো, বিদ্বেষী পশ্চিমা লেখক ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদদের পক্ষ হতে ইসলামী ইতিহাসের প্রামাণ্য যুগ ও যুগনায়কদের

১. আল্লামা নদভী (র) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৯৮-১০০।

সমালোচনা শুরু হলো এবং ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বিকৃত ও কালিমালিপ্ত করার অপচেষ্টা শুরু হলো, তখন সমসাময়িক আলেম সমাজ থেকেই স্বনামধন্য লেখক-সাহিত্যিক ও কলম-মুজাহিদগণ ময়দানে এসেছেন এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দস্যুতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উম্মাহকে তারা এমন কালজয়ী গ্রন্থসম্ভার উপহার দিয়েছেন, যা শুধু ইসলামিয়াতের ক্ষেত্রেই নয়; বরং উর্দু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ছিলেন অনন্য। আলেম সমাজ তাদের যুগোপযোগী চিন্তা-গবেষণা ও সাহিত্য-সাধনা দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত সমাজকে হৃদয় ও চিন্তার জগতে এমনভাবে আশ্বস্ত করেছেন যে, ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেমন দূর হলো, তেমনি ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যও সুদৃঢ় হলো। উদাহরণস্বরূপ মাওলানা শিবলী নোমানী (র.)-এর 'আল-ফারূক', 'কুতুবখানা ইসকান্দারিয়া' ও 'আল-জিযরা ফিল ইসলাম' ছিল এ বিষয়ে সফল সাহিত্যকর্ম।[১]

দীনের প্রতিনিধিত্বের জন্য বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন

প্রিয় বন্ধুগণ! বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের এ যুগে দীন ও শরীয়তের স্বার্থক প্রতিনিধিত্ব, ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাখ্যা উপস্থাপন এবং সময় ও সমাজের সামনে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও বহুমুখী যোগ্যতার প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, তোমরা হলে ইসলামের সিপাহী। এখানে তোমরা আগামী দিনের জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো। কোন ফৌজি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে আধুনিক ও প্রাচীন অস্ত্র কিংবা একেলে ও সেকেলে সমর কৌশল সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা। যোদ্ধা ও সিপাহীর কাছে কোন অস্ত্রই নতুন বা পুরাতন নয়। সে শুধু জানতে চায়, এখন রণাঙ্গনে কোন অস্ত্র এবং কোন সমর কৌশল অধিক কার্যকর?

কোন বিশেষ অস্ত্র বা সমর কৌশলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অবকাশ তার নেই। তাকে তো প্রয়োজনীয় সব অস্ত্রই হাতে নিতে হবে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপযোগী সব রণকৌশলই গ্রহণ করতে হবে। আরব কবি অনেক আগেই বলে গেছেন– 'যোদ্ধা তো যুদ্ধ-দিনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেষ্ট হয়।'

প্রিয় বন্ধুগণ! তালেবানে ইলম এবং ওয়ারিসে নবী হিসাবে যামানার নতুন নতুন ফিতনা সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই অবগত থাকতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, অজ্ঞতার চেয়ে অপরিপক্কতা অনেক বেশী ক্ষতিকর। বর্তমানে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে নিছক ফ্যাশন হিসাবে কিছু কিছু আন্দোলন ও বাদ-মতবাদের

১. আল্লামা নদভী (র.)-বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১১০-১১২।

আলোচনা হয়, কিন্তু সে সম্পর্কে তথ্য-অবগতি খুবই সামান্য, সুগভীর অধ্যয়ন ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা তো অনেক পরের কথা। কোন বাতিল মতবাদ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এমনকি মৌলিক জ্ঞানও আমাদের নেই। অথচ সময়ের দাবি হলো, শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় প্রচলিত চিন্তাধারা ও বাদ-মতবাদ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা এবং সেগুলোর মোকাবেলায় ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সন্দেহ নেই যে, এ কাজ অতি কঠিন, তবে অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে আমাদেরকে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। সময়ের দাবিকে তো অস্বীকার করা যাবে না, যায় না। তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে না হলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবেই তা হতে থাকবে, যা কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী বয়ে আনবে।[১]

দেশের ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে

এখানে আমি দু'টি বাস্তব সত্যের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথম, কোন দেশে, কোন সমাজে দীনের খেদমত ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং গণজীবনে পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যে পূর্ণ পারদর্শী ও পরিচ্ছন্ন রুচির অধিকারী হওয়া এবং জীবন্ত ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায় বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা অপরিহার্য। মুখের ভাষা যদি হয় মর্মস্পর্শী এবং কলমের গতি যদি হয় সাবলীল, তখন দীনের দাওয়াত হয় অধিকতর কার্যকর ও ক্রিয়াশীল। এটা এমনই এক মনস্তাত্ত্বিক সত্য ও সাচ্চা হাকীকত যে, যুগে যুগে নবী-রাসূলকেও সর্বোত্তম ভাষা দান করা হয়েছে, যাতে স্বজাতিকে তিনি পূর্ণ আস্থার সাথে সম্বোধন করতে পারেন এবং তার বক্তব্য যেন জাতির মন-মস্তিষ্কে ও হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

'এই কিতাবকে আমি আরবী ভাষার কুরআন রূপে নাযিল করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।'

কোথাওবা বলা হয়েছে–'বিলিসানিন আরাবিয়্যিন মুবীন' অর্থাৎ সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছি'। আবার ইরশাদ হয়েছে–"ওয়া মা আরসালনা মিন রাসূলিন ইল্লা বিলিসানি ক্বাওমিহি"। অর্থাৎ কোন রাসূলকে আমি তার কওমের ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি।'

বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ জানেন, 'লিসানুল কাওম' বা 'কওমের ভাষা' দ্বারা শুধু এতটুকু উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি তাদের কথা বোঝেন এবং তারাও তার কথা বোঝে; বরং

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১১৩।

উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তার যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ মানে উত্তীর্ণ হবেন, বরং সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন। এ ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় এখান থেকে যে, আলোচ্য আয়াতে এরপরই বলা হয়েছে "লিয়ুবায়্যিনা লাহুম" অর্থাৎ যেন তিনি তাদের জন্য বয়ান করতে পারেন।' আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন– "আনা আফসাহুল আরব" অর্থাৎ 'আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী।'

তোমরা জান, ইসলামী উম্মাহর তাজদীদ ও সংস্কারের ইতিহাসে এ পর্যন্ত যারা অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কর্ম এবং বড় বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং মুসলিম সমাজের মন-মানব ও চিন্তা-চেতনায় গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন সাধারণত তারা ভাষা ও সাহিত্যের এবং মুখ ও কলমের প্রবল শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাদের কথায় ও লেখায় ছিল উন্নত সাহিত্য-রুচি ও অলঙ্কার সৌন্দর্যের অপূর্ব প্রকাশ।

হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (র)–এর মাওয়ায়েয ও নীতিবক্তৃতাগুলো আজও জাদু-বাগ্মিতা ও আবেদনময়তার জীবন্ত নমুনা রূপে স্বীকৃত। তদ্রূপ মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র)-এর মাকতুবাত সাহিত্যের গতি ও শক্তি এবং সাবলীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার বিচারে সে যুগের 'রাজ সাহিত্যিক' আবুল ফযল ও ফয়যীর কলম-কুশলতা ও সাহিত্যমান থেকে বহু উচ্চস্তরে সমাসীন। তদ্রূপ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.)–এর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' হচ্ছে আরবী সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষার এমন অনন্য সুন্দর নিদর্শন যে, মুকাদ্দমা ইবনে খালদুনের পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তার চেয়ে উত্তম কিছু আমাদের নযরে পড়ে না। শাহ সাহেবের ফারসী রচনায়ও যথেষ্ট সৌন্দর্য ও সাবলীলতা রয়েছে। 'ইযালাতুল খিফা' কিতাবের কোন কোন অংশ তো ফারসী সাহিত্যের উজ্জ্বল নমুনা রূপে পেশ করা হয়।

এটা তখনকার কথা যখন আরবী ও ফারসী ছিল উপমহাদেশে মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির স্বীকৃত ভাষা। পরবর্তীতে যখন উর্দূ ভাষার প্রচলন হলো এবং তা সাধারণ মানুষের প্রধান ভাষার মর্যাদা লাভ করলো তখন খোদ দেহলভী পরিবারের সন্তানগণই উর্দূকে 'কলমের ভাষা' রূপে গ্রহণ করলেন। শাহ আব্দুল কাদের (র) –এর কুরআন তরজমা দিল্লীর টাকশালী উর্দূর সুন্দরতম নমুনা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং প্রামাণ্যতা, সাহিত্যগুণ ও অলংকার সৌন্দর্যের কারণে উর্দূ ভাষার ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। তদ্রূপ মাওলানা নানুতবী (র)-এর উর্দূ রচনা এমন সরল ও সাবলীল যে, পাঠকের রুচিবোধেও গুরুভার মনে হয় না।

পাক-ভারত উপমহাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব সুদীর্ঘকাল আলেম সমাজের হাতেই ছিল এবং তারাই এদেশের সাহিত্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন

করেছেন। খাজা আলতাফ হোসাইন হালী, মৌলভী নযীর আহমদ দেহলভী এবং মাওলানা শিবলী নোমানীকে অতি সঙ্গত কারণেই উর্দূ ভাষার নির্মাতাদের কাতারে শামিল করা উচিত। উর্দূ ভাষার ওলামায়ে কেরাম তাদের সূক্ষ্ম রুচি, স্বভাব-বিশুদ্ধতা, রসবোধ ও রচনাকুশলতার এমন অনন্য সাধারণ নমুনা রেখে গেছেন, যা উর্দূ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে গণ্য হয়। মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানীর রচনাসমগ্র এবং নাযিমে নদওয়াতুল উলামা মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হাই (র)–বিরচিত 'তাযকিরায়ে গুলে রা'না' এবং 'ইয়াদে আইয়াম' হচ্ছে উর্দূ গদ্যসাহিত্যের এমন অপূর্ব নমুনা যাতে ইতিহাসের গাম্ভীরতা, সাহিত্যের কুশলতা ও অলংকারের বর্ণিলতার ঈর্ষণীয় সমাবেশ ঘটেছে। সর্বোপরি প্রাতঃস্মরণীয় মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী (র)–তো উর্দূ সাহিত্যকে জ্ঞান গবেষণা ও সাহিত্য রচনা দ্বারা চিরঋণী করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী এখন যেমন, তেমনি আগামী বহুদিন ভাষা ও সাহিত্যের এবং চিন্তা ও গবেষণার মানদণ্ড বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ মাওলানা আবুল কালাম আযাদের রচনাবলীও উর্দূ-ভাষাকে নতুন শক্তি ও গতি এবং নতুন ভঙ্গি ও শৈলী দান করেছে। তার সম্পাদিত 'আল-হেলাল' এর 'সিহরে হালাল'ও ভাষা-যাদু তো সমগ্র ভারতবর্ষকে বিমুগ্ধ করে রেখেছিল। এমনকি সাহিত্য ও সংবাদপত্র জগতে এখনো তার নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে।

আলেম সমাজের এই জাগ্রত চেতনা এবং সময় ও সমাজমনস্কতার সুফল এই ছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে কখনো জাতি নির্মাণের মহান কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতার এবং সমাজের গতি ও প্রবণতা সম্পর্কে অজ্ঞতার অভিযোগ উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আলেমগণ স্বদেশে কখনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে থাকার চেষ্টা করেননি এবং কোন কোন দেশের আলেমদের মত যামানার কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়েননি। দীনের দাওয়াত, উম্মাহর খেদমত এবং সমাজকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে সে ভাষাই তারা ব্যবহার করেছেন, যা তখনকার সমাজে সুপ্রচলিত ছিল এবং সাহিত্যিক মহলে যার কদর ও সমাদর ছিল।

ওলামায়ে কেরামের এ ঐতিহ্য আমাদেরও ধরে রাখতে হবে এবং এ মহান উত্তরাধিকার যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করতে হবে। আজকের যুগেও যদি আমরা দীনের যথার্থ খেদমত আঞ্জাম দিতে চাই এবং বিশিষ্ট-সাধারণ সর্বমহলে আমাদের চিন্তা-বিশ্বাস ও বক্তব্য পৌঁছাতে চাই তা হলে আমাদেরকে অবশ্যই যুগের ভাষায় কথা বলতে হবে এবং যুগের ভাষায় লিখতে হবে। এটা ভাবগাম্ভীর্যের বিপরীত যেমন নয়, তেমনি পূর্বসূরীদের রীতি-নীতিরও পরিপন্থী নয়, বরং এটাই দীনী প্রজ্ঞার দাবি।[১]

১. আল্লামা নদভী (র) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ১১৪-১১৭।

আরবী ভাষার গুরুত্ব

সব সময়ের মত এখনো আরবী ভাষা জীবন্ত ও গতিশীল ভাষা। আরব বিশ্বে আরবী ভাষা এখন তার পূর্ণ জোয়ার ও যৌবনকাল অতিক্রম করছে এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশ্ব-সভায় আরবী ভাষা এখন আইন ও সংবিধান, জ্ঞান ও দর্শন, সাহিত্য ও সংবাদপত্র এবং রচনা ও গবেষণার ভাষা রূপে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। আমাদের মাদ্রাসা-মহলে এ ভুল ধারণা শিকড় গেড়ে বসেছে যে, প্রাচীন আরবী ভাষা এখন হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে তার বিচরণ নেই। পক্ষান্তরে আধুনিক আরবী নামে নতুন এক ভাষা আত্মপ্রকাশ করেছে যার সাথে দীন ও ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এই মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার হয়ে আলেম ও তালেবে ইলম সমাজ আরবী ভাষা চর্চার প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার ওপর যদি তোমরা আস্থা রাখতে পারো তা হলে আমি পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলতে চাই যে, তথাকথিত আধুনিক আরবীর কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। আরব বিশ্বে লেখক সাহিত্যিকদের কলমে এবং জ্ঞানী-গুণীদের মজলিসে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তা কুরআন ও হাদীস এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামী যুগের ভাষার নিকট থেকে নিকটতম ভাষা। এমনকি আধুনিক যুগের দাবি ও প্রয়োজন পূরণের জন্যেও তারা আরবী ভাষার প্রাচীন ভাণ্ডার ও কুরআন-হাদীস থেকেই শব্দ সংগ্রহ করেছেন। এ বিষয়ে তারা যে অনন্য সাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসাযোগ্য। মিশরে নেপোলিয়নের হামলার পর আরবী ভাষার ওপর পশ্চিমা ভাষার যে প্রবল আগ্রাসন শুরু হয়েছিল আলেম সমাজ শুধু যে তার সফল মোকাবেলা করেছেন তাই নয়; বরং অনুপ্রবেশকারী সমস্ত শব্দকে তারা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন এবং সেগুলোর স্থানে খাঁটি আরবী শব্দের ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন।

আরব বিশ্বে ভাষা ও সাহিত্যের মান এখন এত উন্নত এবং সংবাদপত্র ও প্রকাশনা বিপ্লবের সুবাদে ভাষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার এত সার্বজনীন যে, আরবীতে কলম ধরার জন্য এখন বিরাট প্রস্তুতি ও চর্চা সাধনার প্রয়োজন। আমাদের মাদ্রাসা-মহলে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার যে অবস্থা তাতে আরব দেশে আরবদের মাঝে দীনী ও দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করা এক কথায় অসম্ভব। সুতরাং যদি আরব জাহানে দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিতে হয় এবং ভারতবর্ষের ইলমী খেদমত ও দাওয়াতী মেহনত আরবদের সামনে তুলে ধরতে হয়, সর্বোপরি যদি আরব বিশ্বের সাথে আমাদের দীনী রাবেতা ও ধর্মীয় বন্ধন জোরদার করতে হয় তা হলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পরিপূর্ণ ও পরিপক্ব জ্ঞান ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আর সে জন্য ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন।

বিশেষত বর্তমান যুগে পাক-ভারত উপমহাদেশ এবং এখানকার ওলামা সমাজ আরব জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কেননা বিশ্ব রাজনীতিতে আরব জাহান ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা এখন বেশ জোরদার এবং দিন দিন তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাছাড়া পিছনে যেমন, তেমনি এখন এবং তেমনি ভবিষ্যতেও আরব বিশ্বই হবে ইসলামী জাহানের প্রাণ-কেন্দ্র এবং আরব জাতিই হবে মুসলিম উম্মাহর প্রত্যাশিত নবজাগরণের উৎস। সুতরাং পাক-ভারত উপমহাদেশের আলেম সমাজ যদি আরব জাহানের সঙ্গে দীনী, ইলমী ও কলবী সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টায় ব্রতী না হয়, তবে তা তাদের ভবিষ্যতের জন্য যেমন শুভ হবে না, তেমনি এদেশ ও আরব দেশ কারো জন্যই কল্যাণকর হবে না। অতএব এদিকেও আমাদের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন। ভাষা ও সাহিত্য হলো জীবন্ত ও গতিশীল বিষয়। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কিছু সময়ের জন্যেও যদি তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং চলমান কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়ে তা হলে দীর্ঘদিন তার ক্ষতি ও মাশুল আদায় করতে হয়।[১]

নতুন যুগের নতুন ফেতনা

নতুন যুগ এখন নতুন ফেতনা নিয়ে সামনে এসেছে। জাহেলিয়াত নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। আগে ছিলো বিদ'আতের মু'আমালা, কিন্তু এখন শুরু হয়েছে প্রকাশ্য মূর্তি পূজার মোকাবেলা। আগে ছিল সর্বেশ্বরবাদের শ্লোগান, কিন্তু এখন শুরু হয়েছে এক ধর্মবাদের জিগির। শুরু হয়েছে জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদসহ বিভিন্ন বাদ-মতবাদের নতুন নতুন ধর্ম। এগুলো এখন আমাদের ধর্মীয় চেতনা, আমাদের দীনী গায়রাত এবং আমাদের তাওহীদী আকীদাকে চ্যালেঞ্জ করছে। এখন দেখার বিষয় এই যে, এক সময় যারা সামান্য বিদ'আত ও রসম-রেওয়াজকে ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল না, তাদের উত্তরাধিকারীরা এই সব শিরক ও কুফ্রীকে কীভাবে বরদাশত করে এবং এগুলোর মোকাবেলায় তাদের নীতি ও অবস্থান কেমন হয়? আমরা তো আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের দীনী হিম্মত ও সাহসিকতা, দীনী গায়রাত ও চেতনার কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাক্ষ্য দিই যে, বাতিলের সামনে তারা মাথা নত করেননি। এখন দেখার বিষয় এই যে, আমাদের সম্পর্কে আমাদের পরবর্তীরা কী সাক্ষ্য দেবে? এবং ইতিহাসের পাতায় আমরা কী স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছি?

প্রিয় বন্ধুগণ!

আসমানী তাকদীরের ফায়সালা আমাদের জন্য যে যুগ ও সময় নির্বাচন করেছে তার দায়-দায়িত্ব বিগত সময়ের তুলনায় অনেক বেশী। তবে আল্লাহর দরবারে তার

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ১১৭-১১৮।

প্রতিদান ও সম্মানও অনেক বেশী। ঝুঁকি ও ক্ষতির ভয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং সময়ের প্রতিকূলতার কাছে পরাজয় স্বীকার করা সাহসী পুরুষের কাজ নয়, কাপুরুষের কাজ। তোমাদেরকে অবশ্যই সাহসের পরিচয় দিতে হবে এবং এগিয়ে আসতে হবে আগামী দিনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তোমাদের হাতে এখনো যতটুকু সময় আছে সেটাকে প্রস্তুতির কাজে ব্যয় করো। সময়ের গুরুতরতা এবং দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করো এবং নিজেকে মূল্যবান ও ফলবানরূপে তৈরী করো, যাতে আগামী দিনের কর্মের ময়দানে উম্মতের সৌভাগ্য নির্মাণে গৌরবময় অবদান রাখা সম্ভব হয়। কবির ভাষায়–

'গাফেল হয়ো না, সময় কারো জন্য বসে থাকে না।'

প্রিয় বন্ধুগণ!

এ যুগের আসল ফেতনা ও চ্যালেঞ্জ কী? তা এই যে, ইসলামকে তার নিজস্ব তাহযীব-তামাদ্দুন, নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতি, নিজস্ব শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টি থেকে এক কথায় ইসলামকে তার সমগ্র উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে, যাতে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের মত ইসলাম ও মুসলিম জাতিও কতিপয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিয়ে-শাদী ও দাফন-জানাযার রুসুমাত নিয়েই তুষ্ট থাকে। এভাবে ইসলাম যেন নিছক আচার-প্রথার ধর্মে পরিণত হয় এবং চিরদিনের জন্য মুসলমান যেন ভুলে যায় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।[১]

দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে হলে অধিকতর উপকারী হতে হবে

এই বিশ্বজগতে আল্লাহর যে অটল বিধান শুরু থেকে কার্যকর এবং আল কুরআন আমাদের সামনে যে সত্য তুলে ধরে তা হল, অধিকতর উপকারীই শুধু টিকে থাকবে। আজকের পৃথিবী অবশ্য যোগ্যতরের অধিকারের (Survival of the Fittest) কথা বলে, কিন্তু আল কুরআন ঘোষণা করেছে অধিকতর উপকারীর বেঁচে থাকার বিধান এবং এটাই সত্য। সূরাতুর-রা'দ-এর এক আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে। তোমরাও হয়ত বারবার পড়েছো এবং তাফসীরও দেখেছো 'ফেনা ও খড়কুটা যা তা ভেসে যাবে, আর যা মানুষকে উপকার দান করে তা জমিনে টিকে থাকবে। এভাবেই আল্লাহ উদাহরণ তুলে ধরেন।'

সময় ও সমাজের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা নেই, যার কাছে কোন পয়গাম ও বার্তা নেই, যার কোন দান ও অবদান বর্তমান নেই, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতি যার ওপর নির্ভরশীল নয় এবং মানবতার অস্তিত্ব ও বিকাশ যার মুখাপেক্ষী

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১২১-১২২, ১৩৪।

নয়, তা নিজেও অস্তিত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে আল কুরআন 'যাবাদ' বলে আখ্যায়িত করেছে, যা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অর্থবহ শব্দ।

'যাবাদ' হলো সাগরের ফেনা, যার ভেতরে স্বতন্ত্র সত্ত্বাগত অস্তিত্ব নেই, যার মাঝে স্থিতি ও স্থায়িত্বের যোগ্যতা নেই। কেননা ফেনা শুধু সাগরের স্ফীতির একটি বাহ্যিক প্রকাশ। তাতে কোন বস্তুগুণ ও জমাটতা নেই, বাতাসপূর্ণ ফাঁপা অবস্থামাত্র কিংবা ধরুন, নীচের কিছু ময়লা ওপরে ভেসে উঠেছে, মানুষের উপকার করার কোন যোগ্যতা নেই। পানির ওপর দিয়েই তা ভেসে যাবে। কিংবা কিনারে গিয়ে কোন কিছুর সাথে আটকে যাবে, তার স্থায়ী কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কেননা, তার মাঝে অস্তিত্ব রক্ষার যোগ্যতা নেই। আল্লাহর বিধান এ অনুমতি দেয় না যে, 'যাবাদ' বা সাগরের ফেনা বেশী সময় বাকি থাকবে। কেননা, বিশ্বজগতে এতটা প্রশস্ততা নেই যে, সাগরের যুগ যুগের ফেনা ও খড়কুটো সে ধারণ করতে পারে। সাগর-ফেনার মত 'অপদার্থ' যদি বাকি থেকে যায় তাহলে তো মানুষের উপকারের জন্য যেগুলোর বাকি থাকা উচিত সেগুলোর জন্য সমস্যা সৃষ্টি হবে। তাই আল্লাহর অটল বিধান এই যে, যা মানুষের উপকার করবে এবং যা মানুষ ও মানবতার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে তাই শুধু পৃথিবীতে বাকি থাকবে।

যামানা শুধু বোঝে যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার ভাষা

যত তিক্তই হোক স্পষ্ট সত্য এই যে, আমাদের দীনী মাদ্রাসাগুলো যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় এবং যিন্দেগীর কাফেলায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় এবং সময় ও সমাজের কাছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে নিজের উপকারিতা এবং যোগ্যতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে। সময় ও সমাজের কাছে তাকে এ সত্য তুলে ধরতে হবে যে, চলমান জীবনে তার প্রয়োজন রয়েছে এবং তাকে বাদ দিয়ে সে প্রয়োজন পূর্ণ হতে পারে না; বরং তার অবর্তমানে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হবে, যা মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া অস্তিত্ব রক্ষার এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় নেই। কেননা, সময় ও সমাজ যে ভাষা বোঝে এবং সবসময় বুঝে এসেছে তা হলো যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার ভাষা। এ ভাষা বোঝার জন্য তরজমার প্রয়োজন নেই। আরবীতে বলো কিংবা ইংরেজীতে, যামানা তা বুঝবে। শব্দের ভাষায় বলো কিংবা শব্দহীন ভাষায়, যামানা তা বুঝবে। কেননা, মানুষের ভাষা বিভিন্ন, কিন্তু যামানার ভাষা অভিন্ন। যামানা যে ভাষা বোঝে তা হলো যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার ভাষা, সংগ্রামময় জীবনের মুখরিত অঙ্গনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাষা। আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন, 'জীবন হলো নিরন্তর সংগ্রামের নাম, যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম।'

জীবন কারো দয়া ও দান নয়। জীবন তো যোগ্যতা বলে নিজে অর্জন করতে হয়। তুমি জীবনের অধিকার অর্জন করো। পৃথিবী তোমাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

জার্মানীর ইতিহাস দেখুন, দুই দুইটি বিশ্ব যুদ্ধে পরাজয়ের পরও বিজয়ী শক্তি মানচিত্র থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারেনি; বরং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে। পৃথিবীতে বহু জাতির বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার এমনও জাতি আছে যারা বারবার পরাজিত হয়েও টিকে আছে। তাতারীদের হাতে মুসলিম জাতির এমন পরাজয় ঘটেছিল যে, সম্ভবত দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে তার নজির নেই। কিন্তু তাদের মাঝে ছিলো মানুষের উপকার এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা, তাদের কাছে ছিল একটি যিন্দা দাওয়াত এবং একটি জীবন্ত বাণী ও বার্তা, তাই বিজয়ী তাতারীদেরকে শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে হয়েছিল মুসলিম জাতির সামনে।

তাতারীদের শক্তি ও তলোয়ার মুসলমানদের পরাজিত করেছিল, কিন্তু তাতারীদের দিল ও দেমাগ এবং হৃদয় ও মস্তিষ্ক মুসলমানদের দাওয়াতের সামনে, তাদের উপকারিতা ও কল্যাণকামিতার সামনে অবনত হয়েছিল।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ!

আমাদের দীনী মাদ্রাসাগুলোর সামনে আজ একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে, যিন্দেগীর ময়দানে তাকে তার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে হবে। সময় ও সমাজকে বোঝাতে হবে যে, মাদ্রাসা ও তার কুরবানি যদি না থাকে, দীনী শিক্ষা ও দীনী দাওয়াত যদি না থাকে, তা হলে জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে, কিংবা জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অন্ততপক্ষে জীবনে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হবে, যা আর কেউ পূর্ণ করতে পারে না। এছাড়া নিছক দয়া ও করুণার আবেদন পৃথিবীতে না কখনো গ্রহণযোগ্য হয়েছে, না গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আর এ যুগ তো হলো গণতন্ত্রের যুগ। এখন যদি বলি অমুক সরকার আমাদের প্রতি সদয় ছিল, অমুক সরকার আমাদের রক্ষা করেছে, অমুক অমুক যুগে আমাদের বড় শান-শওকত ছিল, তোমরাও দয়া করে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করো, আমরা তোমাদের ক্ষতির কারণ হবো না। কিংবা যদি বলি, এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাদ্রাসা ও আলেম সমাজের অবদান ছিল, সুতরাং আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তাহলে, আমার কথা বিশ্বাস করো, আজকের পৃথিবী তা মেনে নেবে না। পৃথিবী এখন অনেক বেশী হিসেবী, অনেক বেশী স্বার্থনিমগ্ন।[১]

---

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১৫৯-১৬২।

কামাল ও পূর্ণতা কাকে বলে?

অবশ্য নারাজ না হলে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, কামাল ও পূর্ণতা কাকে বলে? কোন বিষয়ের সাধারণ ধারণা ও লঘু জ্ঞানকে অবশ্যই কামাল বলে না। আরবী ভাষায় দু'টো কথা বলতে পারা, দু'কলম লিখতে পারা এবং কিতাবের ইবারত পড়তে পারাকে কামাল বলে না। কামাল ও পূর্ণতা তো এমন এক শক্তি, যা নিজেই নিজের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি, যুগের পরিবর্তন ও সময়ের প্রতিকূলতার কথা বলে হায় হুতাশ করা আসলেই ভিত্তিহীন।

যারা তোমাদের বলে বেড়ায় যে, কোথায় কোন চক্করে পড়ে আছো? কীসের পিছনে সময়ের অপচয় করছো! চেয়ে দেখো, সময় ও সমাজ কত বদলে গেছে! জীবনের সর্বত্র পরিবর্তনের কেমন দোলা লেগেছে! ধর্মজ্ঞান ও আরবী শিক্ষা এ যুগে কী কাজে আসবে? তার চেয়ে পড়তে যদি কলেজ-ভার্সিটিতে, করতে যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা-সাধনা, তাহলেই না সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতে। এসব কাঁচা বুদ্ধির কাঁচা কথা। বাস্তব সত্য এই যে, পৃথিবীর যে কোন বিষয়ে তুমি কামাল ও পূর্ণতা এবং যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করো, তখন তোমার মুখে আর এ অভিযোগ উচ্চারিত হবে না যে, যামানা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না, সময় আমাকে সুযোগ দেয় না। আমাদের দীনী শিক্ষার যা কিছু অবক্ষয় ও অবমূল্যায়ন তুমি দেখতে পাচ্ছো তার কারণ যোগ্যতা ও পূর্ণতার অভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দেখ, এক সময় হিন্দুস্তানব্যাপী ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের একচ্ছত্র জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল এবং সারা দেশের সর্বত্র হেকীম সাহেবদের দাওয়াখানা ছিল। হিন্দু-মুসলমান, নেককার-বদকার ও আলেম-জাহেল নির্বিশেষে সমস্ত রোগী হেকীম সাহেবদের শরণাপন্ন হতো। দাওয়াখানায় রোগীর ভীড় লেগে থাকতো এবং তাদের সামাল দিতে হেকীম সাহেব রীতিমত হিমশিম খেতেন, কিন্তু এখন! বেচারা হেকীম ও তার দাওয়াখানার করুণ অবস্থা দেখে সত্যি করুণা হয়।

তোমরা কি মনে করো যে, ইউনানী চিকিৎসার পতনের কারণ হলো দেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা ও আধুনিক ঔষধের আগ্রাসন? আমি তা স্বীকার করি না। আমার দাবি, ইউনানী চিকিৎসার পতনের মূল কারণ হলো, অতীতের মত বিজ্ঞ হেকীমের অভাব, যাদের মেধা ও হেকমত ছিল অকল্পনীয়। এখনো যদি সেই রকম হেকীমের আবির্ভাব ঘটে তা হলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আধুনিক চিকিৎসার চিকিৎসকরাও তাদের শরণাপন্ন হবেন। আপনার শহরের সিভিল সার্জনও হেকীম সাহেবের দাওয়াখানায় ধর্না দিতে বাধ্য হবেন। আমার কথায় বিন্দুমাত্র

অতিশয়োক্তি নেই। রোগী ও চিকিৎসক সবাই ধর্না দেবে। কেননা রোগযন্ত্রণার উপশম না হলে ধর্না না দিয়ে উপায় কী?

আগে হেকীম পয়দা করুন, তারপর অবস্থা দেখুন। আমি প্রাচীন ইউনানের জালীনুস ও বোকরাতের কথা বলছি না। আমি এ যুগের হেকীম আজমল খান ও হেকীম মাহমূদ খানের কথাই বলছি। এমন কি অন্তত তাদের অর্ধেক যোগ্যতার হেকীমও যদি তৈরী হয়ে যায় তাহলেই ইউনানী চিকিৎসার বিলুপ্তির বিলাপ বন্ধ হয়ে যাবে এবং নব উত্থানের কোলাহল শুরু হয়ে যাবে। আসল ঘটনা এই যে, আগে দরসে নেযামী থেকে ফারেগ হয়ে মেধাবী আলেমগণ প্রায় সকলে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও হযরত মাওলানা মুঙ্গেরী (র.) সম্পর্কে আমার জানা নেই, কিন্তু সে যুগের অধিকাংশ আলেম চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন এবং অনেকে পেশা হিসাবেও তা গ্রহণ করতেন। মেধাবী ও অভিজাত পরিবারের সন্তানরা বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের পর যখন সাধনা ও অধ্যবসায় সহকারে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করতেন তখন তারা এমন বিরল যোগ্যতার অধিকারী হতেন যে, শুধু শিরায় হাত রেখে রোগীর ভিতরে পৌছে যেতেন এবং যেন চোখে দেখে রোগ নির্ণয় করতেন।

বর্তমানে আমাদের মাদ্রাসাগুলোরও একই অবস্থা। আমাদের সমস্যা বিষয়ের নয়, সমস্যা হলো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের পূর্ণতা ও যোগ্যতার এবং মেধা ও প্রতিভার। তুমি যে কোন শাস্ত্রে এবং ইলমের যে কোন শাখায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করো, পূর্ণতা ও গভীরতা লাভ করো, দুনিয়া তোমার ধার ও ভার স্বীকার করবে এবং তোমার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করবে এবং তোমার জীবন ও জীবিকা সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের মাদ্রাসাগুলোর সামনে এখন যে সব সমস্যা ও প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা 'আপসে আপ' দূর হয়ে যাবে। কেননা যা কিছু সমস্যা তা মূলত আমাদের দুর্বল মনোবল ও কর্মবিমুখতার অনিবার্য ফসল।[১]

যোগ্য হও, দেওবন্দ ও নদওয়া-ই তোমাকে ডাকবে

আমার প্রিয় তালেবান ইলম!

আসল ত্রুটি তো এই যে, তোমরা মেহনত ছেড়ে দিয়েছো। তোমাদের মাঝে নেই পূর্ববর্তীদের আবেগ-উদ্যম এবং প্রতিযোগিতার মনোবল। ইলমের কোন শাখায় কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করা তোমাদের কাছে গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। অথচ আমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা এই ছিলো যে, মাদ্রাসার মুদাররিসির মোকাবেলায় দুনিয়ার বাদশাহী কবুল করতেও তারা ছিলেন নারাজ। তাদের কাছে

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৫-১৬৭।

শিক্ষকতার মর্যাদা ছিলো এত বড় যে, রাজ্যের ওযারতির প্রস্তাবও তারা হেলায় প্রত্যাখ্যান করতেন। অনেকে এমনও ছিলেন যে, ওযারতির দায়িত্ব পালন করছেন, আবার নিবেদিতপ্রাণ উস্তাদ হিসাবে দরসও দিচ্ছেন। উযীর আসাফুদ্দৌলা ও সা'আদত আলী দিনে ছিলেন কর্মব্যস্ত উযীর, আর রাত্রে ছিলেন আত্মনিমগ্ন মুদাররিস। এ ধরনের বহু উদাহরণ তুমি পাবে। অযোধ্যার স্বনামধন্য উযীর তাফাযযাল হোসেন খান যখন দরসের মসনদে বসতেন, মনে হতো একজন শিক্ষক ছাড়া তিনি আর কিছু নন।

উদাহরণ আরো আছে। কিন্তু এখন আমি-তুমি তো মুদাররিস বলে পরিচয় দিতে রীতিমত সংকোচ বোধ করি। সুতরাং দিলের বড় দরদের সাথে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই যে, ভিতর থেকে নিজেদের মাঝে যোগ্যতা ও পূর্ণতা সৃষ্টি করো। মেহনত ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। ইলমের জন্য এবং জ্ঞানের তলদেশে পৌছার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করো। কোন না কোন শাস্ত্রে কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করো।

একথা ভাববার আদৌ প্রয়োজন নেই যে, দেওবন্দ ও নদওয়ায় সুযোগ না পেয়ে তোমরা দূরাঞ্চলে পড়ে আছো। নদওয়া বলো দেওবন্দ বলো কোন প্রতিষ্ঠানেরই কোন বিশেষত্ব নেই। এখানে থেকেও তুমি মেহনত ও সাধনা করতে পারো এবং যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জন করতে পারো। তখন স্বয়ং দেওবন্দ ও নদওয়া তোমার প্রার্থী হবে। আমি লিখে দিতে পারি, তুমি যদি কোন বিষয়ে কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করতে পারো তা হলে নদওয়া ও দেওবন্দ সবখানেই তোমার জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে। তোমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হবে।[১]

দীনী যোগ্যতা অর্জন কর

ইলমী যোগ্যতার পাশাপাশি নিজেদের মাঝে দীনী যোগ্যতাও সৃষ্টি কর। উলামায়ে রাব্বানীর কিছু গুণ এবং তাঁদের নূরানী জীবন ও চরিত্রের কিছু ঝলক তোমাদের মাঝেও থাকতে হবে, যা আমাদের নিকট অতীতের আকাবিরীনের মাঝেও ছিল। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (র.) এবং তাঁর সমকালীন ও সহচর আলেমগণের মাঝে ছিল। কিছুটা নির্মুখাপেক্ষিতা ও তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও আখিরাতমুখিতা তোমাদের অবশ্যই থাকতে হবে এবং ইবাদতের প্রতি সহজাত প্রেম থাকতে হবে। এক কথায় ইবাদতে ও তাকওয়ায় তোমাদের স্তর যেন হয় সাধারণ মানুষের ওপরে।

এজন্য আপনার দু'টি করণীয়, প্রথমতঃ ফনের কামাল ও শাস্ত্রীয় যোগ্যতা, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক, যা ছিল সর্বযুগের ওলামায়ে

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১৬৯-১৭১।

রাব্বানীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যাদের দেখে মানুষ আল্লাহ্‌মুখী হতো, আল্লাহর স্মরণে উদ্বুদ্ধ হতো। যাঁদের সান্নিধ্যে আখেরাতের ইয়াদ তাজা হতো। আল্লাহ-প্রেমের জোশ ও জযবা পয়দা হতো। এই আধ্যাত্মিকতা ও রাব্বানিয়াত কিছু না কিছু অবশ্যই হাসিল করতে হবে।[১]

দয়াপ্রার্থী কোন জাতি বেঁচে থাকতে পারে না

ভাই ও বন্ধুগণ! যদি তোমরা যোগ্যতা ও উপযোগিতার প্রমাণ পেশ না করতে পারো তা হলে শুনে রাখো, শুধু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে, কেবল দয়া ও করুণা প্রার্থনা করে না কোন জাতি ও সম্প্রদায় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, না কোন আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে। তোমরা যদি কোন বাণী ও পয়গাম শুনতে চাও তা হলে তোমাদের সামনে এটাই আমার আখেরী পয়গাম। তোমরা যদি কোন পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা নিতে চাও তা হলে তোমাদের জন্য এটাই আমার একমাত্র পরামর্শ। কিংবা তোমরা যদি কোন আবেদন ও দরখাস্ত গ্রহণ করতে চাও তাহলে তোমাদের খেদমতে এটাই আমার আখেরী দরখাস্ত, এটাই আমার শেষ আবেদন। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। দোআ করি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করুন। তোমাদের ভবিষ্যতকে সমুজ্জ্বল করুন।[২]

উস্তাদকে জীবনের মুরব্বীরূপে গ্রহণ করুণ

উস্তাদের প্রতি তোমাদের অন্তরে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে, প্রত্যেক উস্তাদের সঙ্গে আদবের সাথে আচরণ করতে হবে এবং বিশেষ কোন উস্তাদকে জীবনের মুরুব্বীরূপে এবং আদর্শ ও নমুনারূপে গ্রহণ করতে হবে। তার প্রতিটি নড়াচড়া, ওঠাবসা, কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং নিজের জীবনে তার সফল বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। যারা এটা করতে পেরেছে তাদেরই জীবনভেলা অকুল দরিয়া পার হয়ে তীরে এসে ভিড়েছে এবং তাঁরা কামিয়াব হয়েছে। আর যারা নিজের মত চলেছে তারা মাঝ দরিয়ায় ডুবেছে এবং অতলে তলিয়ে গেছে।[৩]

স্বজাতির ভাষায় দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা এবং লক্ষ্য আদায়ে এর ভূমিকা

আমার সৌভাগ্য যে, বাল্য বয়সে আরবী ভাষা শিক্ষা করার সময় উর্দূ ভাষার শীর্ষস্থানীয় অনেক মূল্যবান বই-পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে,

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ১৭১।
২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৫।
৩. আবু তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত, আল্লামা নদভী (র.) এর বক্তৃতা সংকলন 'তালিবে 'ইলমের জীবন পথের পাথেয়' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা : ২০৯।

যে সব দা'ঈ ও আলেম বাল্যকালে নিজ দেশের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, স্বদেশী সাহিত্যের রুচিবোধ লাভ করতে পারেন না অথবা পরিণত বয়সে মাতৃভাষায় লিখিত বই-পুস্তক পড়ে থাকেন; পরবর্তীতে তারা দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের হৃদয়ে দীনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভাল করে প্রোথিতকরণ, ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দীনি বিষয়ের যথার্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন জটিলতায় ভোগেন। স্বজাতির ভাষা-সাহিত্যে দক্ষতার অভাবে তাদের লেখা বইপুস্তকে সেই শক্তি, প্রভাব, উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য থাকে না, যা এ যুগে অবশ্যই থাকা চাই।[১]

'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'-এ দু'টি গুণ জীবন পাল্টে দিতে পারে

ইলমের ক্ষেত্রে তোমরা পারদর্শিতা অর্জন করো, জ্ঞান ও শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভ করো। বিভিন্ন মাদ্রাসায় সবসময় আমি একটা কথা বলে থাকি যে, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে দু'টি বিষয়কে কামিয়াবি ও সফলতার চাবিকাঠিরূপে সাব্যস্ত করেছি। তা হলো 'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতা ও বিষয়ের বিশেষজ্ঞতা। প্রথম কথা, আমি যা কিছু করবো, যা কিছু পড়বো– পড়াবো এবং শিখবো-শিখাবো তা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ সব বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করবো, কিন্তু অন্তত কোন একটি বিষয়ে পূর্ণ যোগ্যতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করবো।

'ইখলাছ ও ইখতিছাছ'- দু'টি গুণ হলো তালিবুল 'ইলমের সেই ডানা' যা দ্বারা আমাদের কওমী মাদারেসের তালিবানে ইলম ঊর্ধ্বাকাশে উড্ডয়ন করতে পারে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মু'আমালা হবে ইখলাছের এবং ইলমের সঙ্গে মু'আমালা হবে ইখতিছাছের। হাদীস বলো, ফিকাহ বলো, ছরফ ও নাহব বলো, আদব বলো, ভাষা ও সাহিত্য বলো– যে কোন শাস্ত্রের কথাই বলো, তাতে তুমি বিশেষজ্ঞতা ও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করো। তা হলে তুমি যেখানেই থাকো মানুষ তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করবে। তুমি যদি দুয়ার বন্ধ করে ঘরেও বসে থাকো, মানুষ তোমাকে বাধ্য করবে দুয়ার খুলে বের হওয়ার জন্য। মানুষ হাতে ধরে, পায়ে ধরে তোমাকে অনুরোধ করবে যে, আমার সঙ্গে চলুন এবং আমার কাজ করে দিন, আপনার যা কিছু শর্ত ও চাহিদা আমি তা পূর্ণ করবো। যোগ্যতার মাঝে স্বভাবগতভাবেই আল্লাহ্ আকর্ষণের ও বিকাশের গুণ রেখেছেন। তোমার মাঝে কোন বিষয়ে যোগ্যতা থাকবে আর মানুষকে তা আকৃষ্ট করবে না, তা হতে পারে না।

১. আল্লামা নদভী (র.) এর রচিত 'ফী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, খণ্ড : ১ম, পৃষ্ঠা : ৮০।

আফসোস! আজ কওমী মাদারেসের অবস্থা এই হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র ও 'ফন'-এর মাহের উস্তাদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। কিংবা মাদ্রাসা থেকে বিদায় নিলেন, নতীজা অভিন্ন। অর্থাৎ তার স্থান পূরণের জন্য যোগ্য মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই খতরনাক অবস্থার সংশোধন কিন্তু ছোট ছোট মাদ্রাসাগুলো থেকেই সহজে হতে পারে। সফল শিক্ষা জীবনের সর্বোত্তম উপায় হলো ছোট ছোট মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর বড় বড় মাদ্রাসায় গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করা। আমাদের বড় বড় মাদ্রাসাগুলোতে উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র কিন্তু ছোট মাদ্রাসাগুলো থেকেই আসে।[1]

বাংলাদেশী বন্ধুদেরকে বলছি

আপনারা জানেন, ইরতিদাদের ফেতনার যুগে আল্লাহর রাসূলের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) পরিবেশ ও পরিস্থিতির সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে গর্জে উঠেছিলেন–'আমি বেঁচে থাকবো, আর দ্বীনের অঙ্গহানি হবে?'

আপনাদের দেশে এখন ইরতিদাদের ফিতনা শুরু হয়েছে, চিন্তার ইরতিদাদ। সুতরাং সেই সিদ্দিকী ঈমান বুকে নিয়ে আপনাদেরও আজ গর্জে উঠতে হবে বাতিলের বিরুদ্ধে, আমরা বেঁচে থাকতে দীনের ক্ষতি হবে? না, তা হতে পারে না। এখন আপনাদেরকে গৌণ মতপার্থক্যগুলো ভুলে গিয়ে দীন ও ঈমান রক্ষার বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এ মুহূর্তে বড় প্রয়োজন ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যবদ্ধ পথনির্দেশনার।

ইখলাছ ও আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা এবং উন্নত চরিত্রের আলো দ্বারা জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করুন, তাকদীরের ফায়সালায় যাদের হাতে আজ দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে। কিংবা আগামীকাল অর্পিত হতে চলেছে। এ যুগে শাসনক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা, দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সেই সংবেদনশীল অংশটিকে দীনের কাজে প্রতিদ্বন্দী না বানিয়ে সহযোগী বানাবার চেষ্টা করুন। শুধু এবং শুধু দীনের ফায়দার উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য। অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে তাদের ভাষায় এবং তাদের মেযাজে বোঝাতে হবে।

আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস ও আশ্বাস যেন অটুট থাকে যে, আপনারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নন; বরং তাদের ও উম্মতের প্রকৃত কল্যাণকামী। আপনারা নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক। তাদের কাছে আপনাদের যেন কোন প্রত্যাশা না

১. আবু তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত, আল্লামা নদভী (র.)-এর বক্তৃতা সংকলন 'তালিবে ইলমের জীবন পথের পাথেয়' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা : ২০৯-২১০।

থাকে। চাওয়া-পাওয়ার কোন প্রশ্ন যেন না থাকে। সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে, লোভ ও প্রলোভনের হাতছানি হয়তো আসবে। এমনকি হয়তো বা সুযোগ গ্রহণের মাঝে দীনের 'ফায়দা' নজরে আসবে। এ বড় কঠিন পরীক্ষা। তখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অটল-অবিচল থাকতে হবে। ওয়ারিসে নবীর ঈমান ও বিশ্বাস এবং ইতমিনান ও প্রশান্তি নিয়ে আপনাদের তখন বলতে হবে, আপনাদের দুনিয়া আপনাদের জন্য মোবারক হোক, আমরা তো দীনের রাস্তায় আপনাদের কল্যাণ চাই। আপনাদের আখেরাতের সৌভাগ্য চাই। মনে রাখবেন, আপআদের বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ আপনাদের বিনিময় দিতে পারে না।[1]

দেশের ভাষা ও সাহিত্যের বাগডোর হাতে নিতে হবে

যে বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো এ দেশের ভাষা ও সাহিত্য। বাংলাভাষাকে অন্তরের মমতা দিয়ে গ্রহণ করুন এবং মেধা ও প্রতিভা দিয়ে বাংলা সাহিত্য চর্চা করুন। কে বলেছে, এটা অস্পৃশ্য ভাষা? কে বলেছে, এটা হিন্দুদের ভাষা? বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় পুণ্য নেই, পুণ্য শুধু আরবীতে, উর্দূতে, কোথায় পেয়েছেন এ ফতওয়া? এ ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী ধারণা বর্জন করুন। এটা অজ্ঞতা, এটা মূর্খতা এবং আগামী দিনের জন্য এর পরিণতি বড় ভয়াবহ।

এ যুগে ভাষা ও সাহিত্য হলো চিন্তার বাহন, হয় কল্যাণের চিন্তা, নয় ধ্বংসের চিন্তা। বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে আপনারা শুভ ও কল্যাণের এবং ঈমান ও বিশ্বাসের বাহনরূপে ব্যবহার করুন। অন্যথায় শত্রুরা একে ধ্বংস ও বরবাদীর এবং শিরক ও কুফুরির বাহনরূপে ব্যবহার করবে।

সাহিত্যের অঙ্গনে আপনাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করতে হবে। আপনাদের হতে হবে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক-সাহিত্যিক ও বাগ্মী বক্তা। ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখায় আপনাদের থাকতে হবে দৃপ্ত পদচারণা। আপনাদের লেখা হবে শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ; আপনাদের লেখনী হবে জাদুময়ী ও অগ্নিগর্ভা, যেন আজকের ধর্মবিমুখ শিক্ষিত সমাজ অমুসলিম ও নামধারী মুসলিম লেখক সাহিত্যিকদের ছেড়ে আপনাদের সাহিত্য নিয়েই মেতে ওঠে এবং আপনাদের কলম-জাদুতেই আচ্ছন্ন থাকে।

দেখুন! এ কথা আপনারা লক্ষ্ণৌর অধিবাসী, উর্দূভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখক এবং আরবীভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির মুখ থেকে শুনছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমার বিগত জীবন কেটেছে আরবী ভাষার সেবায় এবং আল্লাহ্ চাহে তো আগামী

১. আবু তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত, আল্লামা নদভী (র.)-এর বক্তৃতা সংকলন 'তালিবে ইলমের জীবন পথের পাথেয়' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা : ২১৫-২১৬।

জীবনও আরবীভাষারই সেবায় হবে নিবেদিত। আরবীভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা; বরং আমি মনে করি, আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের কথা থাকুক, আল্লাহ্‌র শোকর আমার খান্দানের অনেক সদস্যের এবং আমার ছাত্রদের অনেকের সাহিত্য প্রতিভা খোদ আরব সাহিত্যিকদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আরবরাও নিঃসংকোচে তা স্বীকার করে।

বন্ধুগণ! উর্দূভাষার পরিবেশে যে চোখ মেলেছে, আরবী সাহিত্যের সেবায় যার জীবন-যৌবন নিঃশেষ হয়েছে সে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ দায়িত্ব সচেতনতার সাথে বলছে, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামবিরোধী শক্তির রহম করমের ওপর ছেড়ে দিবে না। 'ওরা লিখবে, আপনারা পড়বেন'-এ অবস্থা কিছুতেই বরদাশত করা উচিত নয়। মনে রাখবেন, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভুত প্রভাবক শক্তি। এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি, এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। অনেক সময় পাঠক নিজেও তা অনুভব করতে পারে না। অবচেতন মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান লেখকের লেখনী পাঠকের অন্তরেও সৃষ্টি করে ঈমানের বিদ্যুত প্রবাহ। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বলতেন–

'পত্রযোগেও মুরীদের প্রতি তাওয়াজ্জুহ-আত্মসংযোগ নিবদ্ধ করা যায়। শায়খ তাওয়াজ্জুহসহকারে মুরীদের উদ্দেশে যখন পত্র লেখেন তখন সে পত্রের হরফে হরফে থাকে এক অত্যাশ্চর্য প্রভাবশক্তি।'

এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও রয়েছে। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের রচনাসম্ভার আজো বিদ্যমান রয়েছে। পড়ে দেখুন, আপনার সালাতের প্রকৃতি বদলে যাবে। হয়তো পঠিত বিষয়ের সঙ্গে সালাতের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু লেখার সময় হয়তো সেদিকে তাঁর তাওয়াজ্জুহ নিবদ্ধ ছিল। এখন সে লেখা পড়ে গিয়ে সালাত আদায় করুন; হৃদয় জীবন্ত এবং অনুভূতি জাগ্রত হলে দেখবেন, সালাতের ধারা পাল্টে গেছে, তাতে রূহ ও রূহানিয়াত সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা আমার বহুবার হয়েছে। আপনি অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ করবেন, তাদের রচিত গল্প উপন্যাস ও কাব্যের রস উপভোগ করবেন, তাদের লিখিত ইতিহাস গলাধঃকরণ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না, আপনার চিন্তা-চেতনাকে তা আচ্ছন্ন করবে না, এটা কী করে হতে পারে? আগুন জ্বালাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না, এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অস্বীকার করেন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করবেই। আমি মনে করি আপনাদের জন্য এটা বড়ই লজ্জার কথা। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত না হলে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হতো না যে, যে দেশের ভাষায় লক্ষ লক্ষ আলেমের জন্ম হয়েছে সে দেশে সে ভাষায় কুরআনের প্রথম অনুবাদকারী হচ্ছেন একজন হিন্দু সাহিত্যিক।

এ দেশের মুসলিম সাহিত্যিকদের আপনারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরুন। নজরুল ও ফররুখকে তুলে ধরুন। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁদেরও যে অবিস্মরণীয় কীর্তি ও কৃতিত্ব রয়েছে তা বিশ্বকে অবহিত করুন। নিবিষ্ট চিত্ত ও গবেষক দৃষ্টি নিয়ে তাঁদের সাহিত্য অধ্যয়ন করুন, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করুন, তাঁদের সাহিত্য তুলে ধরুন। কত শত আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুসলিম সাহিত্য-প্রতিভার জন্ম এ দেশে হয়েছে তাদের কথা লিখুন। বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে তাদের তুলে আনুন।

আল্লাহ্‌র রহমতে এমন কোন যোগ্যতা নেই, যা কুদরতের পক্ষ হতে আপনাদের দেয়া হয়নি। হিন্দুস্তানে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে এমন অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আমি দেখেছি যাদের মেধা ও প্রতিভার কথা মনে হলে এখনো ঈর্ষা জাগে। পরীক্ষায় ও প্রতিযোগিতায় তাদের মোকাবেলায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররা অনেক পিছনে থাকতো। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মানপত্র দেয়া হয়েছে। আমাদের ধারণাই ছিল না যে, এত সুন্দর আরবী লেখার লোকও এখানে রয়েছে। কখনো হীনমন্যতার শিকার হনেব না। সব রকম যোগ্যতাই আল্লাহ্ আপনাদের দান করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না।

আমার কথা মনে রাখবেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে নিতে হবে। দু'টি শক্তির হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। অমুসলিম শক্তির হাত থেকে এবং অনৈসলামী শক্তির হাত থেকে। অনৈসলামী শক্তি অর্থ ঐসব নামধারী মুসলিম লেখক সাহিত্যিক যাদের মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনা ইসলামী নয়। ক্ষতি ও দুষ্কৃতির ক্ষেত্রে এরা অমুসলিম লেখকদের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

মোটকথা, এ উভয় শক্তির হাত থেকে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নেতৃত্ব ছিনিয়ে আনতে হবে। নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন এবং এমন অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করুন, যেন অন্য দিকে কেউ ফিরেও না তাকায়। আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের হিন্দুস্তানী আলেম সমাজ প্রথম থেকেই এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলে কাব্য সাহিত্য, সমালোচনা, ইতিহাস এক কথায় সাহিত্যের সর্ব শাখায় এখন আলেমদের রয়েছে দৃপ্ত পদচারণা। তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভার সামনে সাহিত্যের বড় বড় দাবিদাররাও নিষ্প্রভ। একবার একটি জনপ্রিয় উর্দূ সাহিত্য সাময়িকীর পক্ষ হতে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিযোগীদের দায়িত্ব ছিল উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নির্বাচন। বিচারকদের রায়ে তিনিই পুরস্কার লাভ করেছেন। যিনি মাওলানা শিবলী নোমানীকে উর্দূ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রমাণ করেছিলেন। উর্দুভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক কোন সম্মেলন বা সেমিনার হলে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভী, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শিরওয়ানী কিংবা

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে। উর্দূ কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর দু'টি বই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো মওলভী মুহাম্মদ হোসাইন আযাদকৃত 'আবে হায়াত', দ্বিতীয়টি আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাই কৃত 'গুলে রা'না' (কোমল গোলাপ)।

মোদ্দাকথা হলো, হিন্দুস্তানে উর্দূ সাহিত্যকে আমরা অন্যের নিয়ন্ত্রণে যেতে দেইনি। তাই আল্লাহ্র রহমতে সেখানে কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, মাওলানা উর্দূ জানে না, কিংবা টাকশালী উর্দূতে তাদের হাত নেই। এখনো হিন্দুস্তানী আলেমদের মাঝে এমন লেখক, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা রয়েছেন যাদের সামনে দাঁড়াতেও অন্যদের সংকোচ বোধ হবে। ঠিক এ কাজটাই আপনাদের করতে হবে বাংলাদেশে।

আমার কথা আপনারা লিখে রাখুন। দীর্ঘ জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন কিংবা বিমাতাসুলভ আচরণ এ দেশের আলেম সমাজের জন্য জাতীয় আত্মহত্যারই নামান্তর হবে।[১]

বহুরূপী শয়তানী জাল ছিন্ন করুন, সর্বত্র ইসলাম নিয়েই শুধু গর্ব করুন

ভাই ও বন্ধুগণ! এ কথা মনে রাখতে হবে, শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে ওৎ পেতে বসে আছে এবং মুহূর্তের জন্যে সে তার মিশন থেকে গাফিল হয় না। নিত্য-নতুন কৌশলে মানুষকে সে বিভ্রান্তির পথে প্ররোচিত করে। বার বার মুখোশ পাল্টায়। কে কোন কৌশলে প্রভাবিত হবে এবং কাকে কোন পন্থায় ইসলামের চির সরল পথ থেকে বিচ্যুত করা যাবে এসব তার নখদর্পণে। আলেম পরিবারে গিয়ে সে চুরির কথা বলবে না। কেননা এটা তার ভালো করেই জানা আছে, আলেম ও বুযুর্গের সন্তান চৌর্যবৃত্তির মতো হীন কাজে লিপ্ত হতে কিছুতেই প্রস্তুত হবে না। সেখানে সে ভিন্ন পথে এগোবে। তাদেরকে আত্মম্ভরী ও অহংকারী করে তুলবে। পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাঁথা নিয়ে বড়াই ও লড়াই করার তালিম দেবে। তদ্রূপ ব্যবসায়ী মহলে গিয়ে প্রথমে সে ওজনে ফাঁকি দেবার কিংবা অবৈধ পথে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলার ফন্দি-ফিকির বাতলে দেবে। অনুরূপ যে জাতিকে আল্লাহ্র দীন ও ঈমানের বিরাট দৌলত দান করেছেন; ইলম, আমল, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বের নেয়ামত দান করেছেন তাদের কানে সে এ ধরনের মন্ত্র দেবে; ইসলাম কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়।

১. আবু তাহের মেসবাহ কর্তৃক অনূদিত, আল্লামা নদভী (র.)-এর বক্তৃতা সংকলন 'তালিবে ইলমের জীবন পথের পাথেয়' শীর্ষক গ্রন্থ হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ঃ ২১৭-২২০।

মুসলমান তো সকলেই। ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা, বর্ণ কিংবা জাতীয়তাই হচ্ছে আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের গর্ব ও গৌরবের বিষয় এবং এগুলোই আমাদের আঁকড়ে ধরা উচিত। এটা হলো শয়তানের সেই মোক্ষম হাতিয়ার, যা সে এমন সুবর্ণ মুহূর্তে সুকৌশলে প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু সকল শয়তানী প্ররোচনার মুখেও তাওহীদের রজ্জুকেই মজবুতভাবে আপনাদের আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকেই মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ১০৩]

ইসলামী উম্মাহ্র মাঝে ফাটল ও বিভেদ সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্য নিয়েই শয়তান জাতীয়তাবাদ, বস্তুবাদ, বর্ণবাদ ও ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতাসহ বিভিন্ন রকমের শয়তানী জাল বিছিয়ে দেয়। তাওহীদবাদী উম্মাহ সেই ইন্দ্রজালে এমনভাবে ফেঁসে যায় এবং আপাত মধুর স্লোগানে এতই মোহগ্রস্ত ও বিভোর হয়ে পড়ে যে, তখন এক মুসলমান অন্য মুসলমানের খুন পিয়াসী হয়ে ওঠে। মুসলমানের হাতে মুসলমানের আবাদ ঘর বিরান হয়, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়, অসহায় বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে, নিষ্পাপ কচি শিশুর চাঁদমুখ নিষ্ঠুর পদাঘাতে থেঁতলে যায়, তবুও হায়েনার উন্মত্ত জিঘাংসা এতটুকু প্রশমিত হয় না।

বন্ধুগণ! এ শয়তানী জাল আমাদের ছিন্ন করতে হবে। ইসলামের ওপরই শুধু আমাদের গর্ব করা উচিত। ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথেই কেবল আমাদের ভালবাসা থাকা উচিত। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্ পাকের দরবারে এক হাবশী গোলামের মর্যাদা অভিজাত বংশীয় একজন সুখী-সুন্দর মানুষের চেয়ে অধিক হতে পারে। কেননা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে- 'তোমাদের মধ্যে যে অধিক মুত্তাকী, আল্লাহ্র দরবারে সেই অধিক সম্মানের অধিকারী।' আল্লাহ্র দরবারে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও ইবাদত এবং ইলম ও আমল।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'অনারবের ওপর আরবের কিংবা আরবের ওপর অনারবের, তদ্রূপ কালোর ওপর সাদার কিংবা সাদার ওপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' ভাষা ও বর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয়। তাকওয়ার ভিত্তিতেই কেবল আল্লাহ্র কাছে মর্যাদা লাভ করা যেতে পারে। আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন কিংবা আপনার চামড়ার রং কালো না সাদা, আল্লাহ্ পাক তা দেখবেন না। তিনি শুধু দেখবেন আপনার ইলম ও আমল কতটুকু ইখলাসপূর্ণ। আপনার হৃদয় কতটুকু পবিত্র ও সহানুভূতিপ্রবণ। আপনার সালাত কতটুকু নিখুঁত, কতটুকু সুন্দর। ইসলামের প্রতি আপনার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা কতখানি। এক কথায় আল্লাহ্র দরবারে তার মর্যাদাও তত অধিক। ইসলামের সম্বন্ধই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সম্বন্ধ।

এজন্যই আল্লাহ্ পাক আমাদের সতর্ক করে দিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা না দেখলেও শয়তান ও তার অনুচরেরা কিন্তু তোমাদেরকে ঠিকই দেখে।'

শয়তানের গতিবিধি খুবই সূক্ষ্ম ও রহস্যময়। কখনো সে মানুষের ওপর ভর করে আসে। কখনো শত্রুর বেশে আসে, আবার কখনো আসে বন্ধুর বেশে। সব ভাষাতেই তার সমান দখল এবং তার ভাষাশৈলীও আমাদের চেয়ে আকর্ষণীয়। বড় হৃদয়গ্রাহী পন্থায় সে তার বক্তব্য উপস্থাপন করে। অতএব, এমন খতরনাক শত্রুর ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। ইসলামের রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন। ইসলামকে নিয়েই শুধু গর্ব করুন। ইসলামের জন্যই জীবন ধারণ করুন এবং প্রয়োজন হলে ইসলামের জন্যই জীবন উৎসর্গ করুন। ইসলামের জন্যই শুধু আল্লাহর দেয়া এ প্রাণ উৎসর্গ করা যেতে পারে, কিন্তু ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্য এক ফোঁটা রক্তও ব্যয় করার অধিকার কারো নেই।[১]

মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা সমাপ্তকারীদের উদ্দেশ্যে বলছি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই একটি শিক্ষাকাল নির্ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকেও তা সমাপ্ত করতে হবে। কিন্তু এখানে আমরা যে মহাগুরুত্বপূর্ণ কথাটি আপনাকে বলতে চাই তা এই যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন কখনো 'সমাপ্ত' হতে পারে না এবং তালিবে ইলম কখনো তলবে ইলম থেকে 'ফারিগ' হতে পারে না। আল্লাহ্ না করুন, আপনি যদি 'শিক্ষা-সমাপ্তি'র অর্থ এই মনে করে থাকেন যে, তালিম ও শিক্ষা অর্জন থেকে আপনি ফারিগ হয়ে গেছেন। অধিক তালিম ও তরবিয়াতের আপনার প্রয়োজন নেই। শিক্ষা-দীক্ষায় আপনি এখন সম্পূর্ণ। কেননা আপনি 'শিক্ষা সমাপ্ত' করেছেন, তা হলে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ ছাড়া পরিষ্কার ভাষায় আমি বলবো, আপনি কিছুই শিক্ষা লাভ করেননি। আপনাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যের পথে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। আর আমরা যারা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, আমরা হয়েছি সর্বস্বান্ত।

তবে আপনাদের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষা সমাপ্তির এবং তালিম থেকে ফারাগতের এই গলদ অর্থ আপনারা গ্রহণ করেননি, বরং আপনাদের মহান পূর্ববর্তীদের কাছে এর যে অর্থ ও মর্ম ছিল আপনারাও তাই বুঝেছেনএবং বিশ্বাস করেছেন।

সুযোগ্য পূর্বসূরীর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে আপনারাও নিশ্চয় বিশ্বাস করেন যে, ফারিগ হওয়ার অর্থ হলো, শিক্ষা লাভের এমন এক স্তরে আপনারা উপনীত হয়েছেন যে, এখন যে কোন বিষয়ে কিতাব হাতে নিতে পারেন এবং সাহস করে জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে প্রয়োজনীয় মণি-মুক্তা তুলে আনতে পারেন, বরং এভাবে বলা

১. আল্লামা নদভী (র.)-র বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ২৭-২৯।

অধিক সঙ্গত যে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ আপনার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আপনি এখন যে কোন তালা খুলতে পারেন এবং যত ইচ্ছা জ্ঞান-সম্পদ আহরণ করতে পারেন। এই চাবিগুচ্ছ আপনি যত বেশী ব্যবহার করবেন তত বেশী লাভবান হবেন, তত বেশী বিদ্বান ও বিত্তবান হবেন।

যে কোন নেসাব ও পাঠ্য ব্যবস্থার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। আমাদের দীনী মাদারেসের নেসাব ও পাঠ্যব্যবস্থা যদি তার শিক্ষার্থীর মাঝে 'আমি কিছু জানি না'-এই অজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি করে দিতে পারে তাহলেই নেসাবের উদ্দেশ্য সফল। তাহলেই এতোসব উদ্যোগ আয়োজন এবং এতোসব শ্রম ও পরিশ্রম সার্থক।

'অজ্ঞতা' শব্দটি হয়ত অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু পূর্ণ সচেতনভাবেই শব্দটির ওপর আমি জোর দিতে চাই। আধুনিক যুগের মানুষ 'সুশীল' ভাষায় এটাকেই 'জ্ঞানমনস্কতা' বলে।

এই অজ্ঞতাবোধ কিংবা জ্ঞানমনস্কতা যদি আপনার মাঝে জাগ্রত হয়ে থাকে তাহলেই আপনি সফল। আপনার শিক্ষা জীবন স্বার্থক। আমি আপনাকে, আপনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এবং আপনাকে গড়ে তোলার কারিগর যারা, তাদেরকে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাবো।

এই ভূমিকা নিবেদনের পর সংক্ষিপ্ত সময়ে আমি আমার বিদায়ী ভাইদের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা আরয করবো এবং আপনাদের সজাগ দৃষ্টি ও পূর্ণ মনসংযোগ আশা করবো।

এক. ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত

মুসলমানদের যিন্দেগীর কামিয়াবির প্রথম কথা হলো ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত। বড় বড় বুযুর্গানে দীন, ইমাম ও মুজতাহিদীন এবং জ্ঞানসাধক ও যুগসংস্কারক, পৃথিবীতে যারা অমর হয়েছেন এবং ইতিহাসের পাতায় যাদের নাম স্বর্ণোজ্জ্বল হয়েছে, যদি তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করেন তা হলে দেখতে পাবেন, ইখলাসই ছিল তাঁদের জীবন বিনির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লিল্লাহিয়াত ও আল্লাহ্র প্রতি আত্মনিবেদনই তাঁদের প্রতিটি কর্ম ও কীর্তিকে এমন অমরত্ব দান করেছে। দরসে নিযামীর 'বাণী' ও প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের কথাই ধরুন। দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে দরসে নিযামীর অপ্রতিহত প্রভাব যুগ যুগ ধরে শুধু পাক-ভারতে নয়, পৃথিবীর আরো দূর দূরাঞ্চলেও অব্যাহত রয়েছে। এত এত সংস্কার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে 'টস থেকে মস' করা সম্ভব হয়নি। কিসের জোরে, কিসের বলে? শুধু জ্ঞান প্রতিভা ও বুদ্ধি-প্রজ্ঞার বলে নয়। কেননা তাঁর সমকালে বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এমন ছিল, যারা মেধায় ও প্রতিভায় এবং জ্ঞানে ও গুণে তাঁর থেকে অগ্রসর, সমকক্ষ অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু লুকিয়ে আছে কী এমন রহস্য যে,

মোল্লা নিযামুদ্দীন তো আজও জীবন্ত, অথচ অন্যদের আলোচনা পর্যন্ত বিলুপ্ত! বরং তাদের নাম উচ্চারিত হয় এই সুবাদে যে, তারা ছিলেন তাঁর সমসাময়িক!

যদি আপনি চিন্তার সঠিক রেখায় অগ্রসর হন এবং তাঁর জীবন ও কর্মের গভীরে প্রবেশ করেন, তা হলে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতেরই মহাশক্তিকে সেখানে ক্রিয়াশীল দেখতে পাবেন। ইখলাস এবং একমাত্র ইখলাসই মোল্লা নিযামুদ্দীনকে অমর জীবন ও অক্ষয় কীর্তি দান করেছে।

ঘটনা শুধু এই ছিল যে, সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবন থেকে 'কিছুই জানি না'র শিক্ষাটুকু তিনি অর্জন করেছিলেন। আর এই 'অজ্ঞতাবোধে' তাঁকে এমনই অস্থির করে তুলেছিল যে, সে যুগের এক উম্মী বুযুর্গ ও নিরক্ষর সাধক পুরুষের দুয়ারে গিয়ে তিনি হাজির হয়েছিলেন, যিনি অযোধ্যার ছোট্ট এক গুমনাম বস্তিতে ইখলাসের পুঁজি ও 'সারমায়া' নিয়ে বসেছিলেন। 'জ্ঞান গরিমা' বিসর্জন দিয়ে নিজেকে মোল্লা নিযামুদ্দীন সেই উম্মী সাধকের সাথে জুড়ে দিলেন এবং তাঁর পদসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিসর্জনই ছিল তাঁর সকল অর্জনের উৎস।

এক্ষেত্রে মোল্লা নিযামুদ্দীন ঐ সকল বুযূর্গের আস্তানায় যেতে পারতেন, যারা ছিলেন 'সময়ের ইমাম' এবং যুগের স্বীকৃত সাধক পুরুষ। কিন্তু নিজেকে তিনি এমন এক গুমনাম ইনসানের হাতে তুলে দিলেন, মানুষের জগত যাকে চিনেছে মোল্লা নিযামুদ্দীনেরই সুবাদে। যদি বলতে যাই তা হলে অসংখ্য উদাহরণ আছে। কিন্তু হৃদয় যদি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকে তা হলে একটি কথাই যথেষ্ট।

দুই. ত্যাগ ও কুরবানী

দ্বিতীয় যে কথাটি আমি আপনাকে বলতে চাই তা হলো ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা। বস্তুতঃ ত্যাগ ও কুরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই মহাশক্তি যে, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয় তা হলে তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি প্রতিষ্ঠান অথবা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয় তা হলে পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ শিক্ষাজীবন থেকে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং যে নীতি ও আদর্শ তুমি অর্জন করেছো তার জন্য তোমার জীবন-যৌবন এবং আপনার বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবকিছু কুরবান করো। নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করো। তারপর দেখ, কোথায় কোন মাকামে আল্লাহ্ আপনাকে পৌঁছে দেন।

তিন. আত্মযোগ্যতা

জীবনের সফলতার জন্য তৃতীয় বিষয় হলো মানুষের আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভা। মানুষ যদি তার আত্মযোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটাতে পারে তাহলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। যুগে যুগে এটাই ছিল মানুষের উন্নতি, অগ্রগতি ও অক্ষয় কীর্তির একমাত্র পথ।

আমাদের সবসময়ের একটি সহজ অনুযোগ এই যে, 'যামানা বদলে গেছে' কিন্তু আপনি যদি ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত্ত, ত্যাগ ও কুরবানী এবং প্রতিভা ও আত্মযোগ্যতার সমাবেশ ঘটাতে পারেন তা হলে দেখতে পাবেন, যুগের কোন পরিবর্তন ঘটেনি; বরং সময় ও সমাজ এখনো আপনাকে বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

পক্ষান্তরে জীবন পথের এই তিন পাথেয় ছাড়া যার সফর শুরু হবে, পৃথিবীর যেখানেই সে যাবে এবং ডিগ্রী ও সনদের যত বাহারই দেখাবে সময় ও সমাজের কাছে সে অবজ্ঞাই শুধু পাবে। আমি আবারো বলছি, এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো আপনি যদি অর্জন করতে পারেন তা হলে আলমগীরের যামানা, নিযামুল মুলক তূসীর যামানা, ইমাম গাযালী, ইমাম ইবনে কাইয়েম ও ইমাম ইবনে তায়মিয়ার যামানা আজো আপনার প্রতীক্ষায় রয়েছে। সেই সোনালী অতীত আবার ফিরে আসতে পারে শুধু আপনারই জন্য।

এ ধারণা অবশ্যই ভুল যে, সময় আগে থেকে জায়গা খালি রেখে কারো অপেক্ষায় থাকবে। আর তিনি যথাসময়ে সেই সংরক্ষিত আসনে বসে পড়বেন। না, এমন কখনো হয়নি, কখনো হবেও না। লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সময় বড় বাস্তববাদী ও অনুভূতিপ্রবণ। সময়ের নীতি হলো যোগ্যতারই টিকে থাকার অধিকার। অযোগ্যতার তো প্রশ্নই আসে না। সময় এত নির্মম যে, যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে যোগ্যতরের এবং উপযোগীর পরিবর্তে অধিকতর উপযোগীর সে পক্ষপাতী।

মোটকথা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও উপযোগিতা যদি থাকে তা হলে যে কোন সময় ও কাল আপনার অনুকূল এবং যে কোন সমাজ ও সম্প্রদায় আপনার জন্য ব্যাকুল। সময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে নিজেদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতাকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। সময় ও কালের কোন পরিবর্তন হয়নি, হয়েছে আমার আপনার। আমরা বদলে গেছি। সে যুগের ইখলাছ ও তাকওয়া এ যুগে নেই। তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা আমাদের মাঝে নেই। প্রতিভা ও আত্মযোগ্যতার বিকাশের যে চেষ্টা সাধনা তাঁদের মাঝে ছিল তা আমাদের মাঝে নেই। সেই যুগ, সেই কাল এখনো আছে, নেই শুধু সেই মানুষগুলো। সেই গুণগ্রাহিতা ও মূল্যায়ন এখনো আছে, নেই শুধু সেই যোগ্যতা ও সাধনা। অর্থাৎ আমাদের মাঝে পরিবর্তন এসেছে, সুতরাং সময়ের স্বীকৃতি আদায় করতে হলে আমাদের মাঝেই পরিবর্তন আনতে হবে।

আমি আশা করি, যে সকল প্রিয় তালেবানে ইলম আজ বিদায় ও বিচ্ছেদ গ্রহণ করে যিন্দেগীর নয়া সফর শুরু করছেন, আগামী কর্মজীবনে তারা এই মূলনীতিগুলো গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যাদের সামনে এখনো সময় ও সুযোগ

আছে, আরো কয়েক বছর যাদের ছাত্রজীবন আছে তারা এই উজ্জ্বল ও মূলনীতি থেকে আরো বেশী কল্যাণ আহরণে সচেষ্ট হবে।[১]

প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি মূলত ইতিহাসের ছাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস, এই ভূখণ্ডে ইসলামী উম্মাহর এই বিরাট জনসংখ্যার উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ফসল। যদি রাজনৈতিক স্বার্থের আবর্জনামুক্ত ইখলাস, মুহব্বত, আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানবপ্রেমের মতো মহান গুণাবলী না হতো তবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। একজন সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করাও আজ আমাদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়, অথচ আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত সহজেই না লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন! ঈমান ও ইখলাসের আলো জ্বেলে শতাব্দীর অন্ধকার মুহূর্তে দূর করে দিয়েছিলেন!

ভূস্বর্গরূপে পরিচিত গোটা কাশ্মীর ভূখণ্ডই হযরত আমীর-ই-কবীর সৈয়দ আলী হামদানীর প্রেম ও ভালোবাসার ফসল। আল্লাহ্র এই প্রেমিক বান্দা ইরান থেকে এলেন। কাশ্মীরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আস্তানা গাড়লেন। আর দেখতে দেখতেই ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরীর হৃদয় জয় করে নিলেন। অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত দলে দলে ছুটে এসে তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করে নিল। তাদের হৃদয়ে ঈমান ও ইখলাস এবং প্রেম ও পুণ্যের এক অনির্বাণ শিখা জ্বলে উঠল। এটা ছিল ইখলাস, আধ্যাত্মিকতা ও আবদিয়াত তথা আল্লাহ্র প্রতি দাসত্ববোধ ও মানবপ্রেমেরই বিজয়।

আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানবপ্রেম যখন সম্মিলিত হয়, এই দুটি উজ্জ্বল নদীর স্রোতধারার যখন সঙ্গম ঘটে, একজন মানুষ যখন আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানবপ্রেমের শীতল স্নিগ্ধ সরোবরে অবগাহন করে পূতঃ পবিত্র হয়ে ওঠে তখন তার বিজয় ও অগ্রযাত্রা হয় অপ্রতিরোধ্য। ঈমানী নূরের রেখা তখন অন্ধকারের বুক চিরে মানুষের হৃদয় রাজ্যের পানে নিজেই নিজের পথ করে নেয়। আল্লাহর দাসত্ব ও মানব প্রেম এমনি এক মহাশক্তি যে, দেশের পর দেশ লুটিয়ে পড়ে তার পায়ে। পাষাণ হৃদয়ও মুহূর্তে বিগলিত হয়ে যায়। সেখান থেকেও তখন উৎসারিত হয় প্রেম ও বিশ্বাসের স্বচ্ছ সুনির্মল ঝরণাধারা। কেননা, প্রেম এক মিলনাত্মক শক্তি। অতীতের মতো আজো পৃথিবীর যাবতীয় বিপদ ও সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইখলাস ও আধ্যাত্মিকতা এবং নিঃস্বার্থ মানবপ্রেম ও মানবসেবা।

---

১. আল্লামা নদভী (র.) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ১৮-২২ ঈষৎ সংক্ষেপিত।

এই পূর্ববঙ্গেও অনেক ওলী-দরবেশ ও জীর্ণ বস্ত্রধারী আল্লাহ্র অনেক প্রেমিক পুরুষ এসেছিলেন। শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আদম সন্তানদের ভালোবেসে তাঁরা বুকে তুলে নিয়েছিলেন। এদেশের স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা আদম সন্তানদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। একদল হলো মানুষ, আরেক দল হলো সেই সব হতভাগা আদম সন্তান, যাদের সাথে যে কোন ধরনের পাশবিক আচরণই ছিল পুণ্যের কাজ। বস্তুত পশুর চেয়েও নীচে ছিল তাদের সামাজিক অবস্থান। কুকুরের স্পর্শে মানুষ অপবিত্র হতো না, কিন্তু অস্পৃশ্য আদম সন্তানদের ছায়া মাড়ালেও স্নান করে পবিত্র হতে হতো। সেই অধঃপতিত আদম সন্তানদের কাছে আল্লাহ্র প্রেমিক বান্দারা এসেছিলেন ইসলামের পয়গাম নিয়ে, তাওহীদের বাণী নিয়ে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।[১]

আপনাদের এ বিশাল জনশক্তিকে কাজে লাগান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে বিদ্যমান দূরত্ব কমিয়ে আনুন

আমি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই এবং এটা কোন তোষামোদ কিংবা চাটুকারিতা নয়, কর্মের ময়দানরূপে আপনাদেরকে আল্লাহ্ পাক এমন এক সরল কোমল মনের অধিকারী, ধর্মপ্রাণ ও ইসলামের প্রতি অনুগত জনশক্তি দান করেছেন যা ইসলামী বিশ্বের খুব কম দেশেই আমি দেখেছি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি আপনাদের খেদমতে আরয করছি, এ নেয়ামতের যথাযোগ্য কদর আপনাদের করা উচিত। ঝানু রাজনীতিবিদ কিংবা জাঁদরেল কূটনীতিবিদের খোঁজ তুমি পৃথিবীর অনেক দেশেই পাবে। বিস্ময়কর প্রতিভাবান লোকেরও হয়ত কমতি হবে না। কিন্তু ইখলাস, মুহব্বত, সরলচিত্ততা ও হৃদয়ার্দ্রতা সবখানে আপনি খুঁজে পাবেন না। সৌভাগ্যের বিষয়, আপনাদের দেশে এগুলো পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এগুলো আপনাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। এমন মূল্যবান সম্পদের এমন নির্দয় অপচয় কিছুতেই মার্জনীয় হতে পারে না।

একবার আমি Toronto তে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাকে Niagara fall দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। এটা নাকি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

কয়েক হাজার ফিট উচ্চতা থেকে প্রবল বেগে প্রচণ্ড শব্দে অনবরত পানি নেমে আসছে। সে এক আজব ব্যাপার! পৃথিবীর সব দেশ থেকেই পর্যটক দল এই জলপ্রপাত দেখতে যায়। আমিও গিয়েছিলাম। আচ্ছা, বলুন তো! এই বিশাল জলপ্রপাত থেকে যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা না হয় কিংবা সেচ ও কৃষি কাজে তা ব্যবহৃত না হয়, তবে কি একে এক বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় বলে গণ্য

---

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৩১-৩২।

করা হবে না! মনে রাখবেন, তদ্রূপ আপনাদেরকেও আল্লাহ্ পাক প্রবল শক্তিধর এক জলপ্রপাত দান করেছেন। সেটা হলো ঈমান ও ইখলাসের জলপ্রপাত, প্রেম ও সত্যের জলপ্রপাত, যা আমি এ জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। এ জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করুন। দেখবেন যে সব সমস্যা আজ জটিল ও সমাধানের উর্ধ্বে বলে মনে হচ্ছে, এক নিমিষেই তার সরল সমাধান হয়ে যাবে। আমি আবার বলছি, কর্মের ময়দানরূপে এক সম্ভাবনাময় জাতি আপনাদেরকে দান করা হয়েছে। কর্মের এমন সর্বোত অনুকূল ময়দান আমি পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখেছি। এ জাতি থেকে যে কোন কাজ আপনরা নিতে পারেন। তবে এটা পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয়। এ হচ্ছে ঈমান, বিশ্বাস, ইখলাস ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিদের কাজ, আপন জাতিকে যারা কল্যাণকর কিছু দেয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, অথচ প্রতিদানের প্রত্যাশী নয়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি লাভই যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য, এ জাতিকে তারা পরশ পাথরে পরিণত করতে পারে। আমি সম্ভাবনার এমন আলোকরশ্মি দেখতে পাচ্ছি, এ জাতি একদিন শুধু বাংলাদেশেই নয়; বরং গোটা আলমে ইসলামীতে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ মনোরম স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুধু তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত উপরিউক্ত নেয়ামতগুলোর কদর করব। সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার করব।

মোটকথা, এ জাতি মহাশক্তিধর এক জলপ্রপাত। একে আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করুন। দীর্ঘদিন থেকে এ বিপুল সম্ভাবনাময় সম্পদের অপচয় হয়ে আসছে এবং এখনো হচ্ছে। এ প্রবাহমান জলপ্রপাত থেকে যদি সঠিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই নয়, গোটা আরব বিশ্বও সে আলোর স্নিগ্ধ পরশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে।

আমি আবার বলছি, আপনারা এ জাতির যোগ্য মর্যাদা দিন। প্রবীণ ও নবীনদের মাঝে এবং আলেম সমাজ ও আধুনিক শিক্ষিত সমাজের আজ যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে, ক্রমশ যে ব্যবধান বিস্তৃত হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব তা অপনোদন করুন। উভয়ের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করুন এবং পরস্পর পরিচিত হন; আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কেবল এ দেশকে, এ জাতিকে অফুরন্ত ঈমানী শক্তির আধার ইসলাম ও ইসলামী উম্মাহর পতাকাবরদাররূপে গড়ে তুলতে পারে। আপনারা ইসলামী উম্মাহর তৃতীয় বৃহত্তম পরিবার। এ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই স্ব স্ব দায়িত্ব, শক্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হতে হবে।[১]

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৫।

দাওয়াতী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যাদের প্রভাব অনস্বীকার্য

দাওয়াত ও চিন্তাধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে সব শিক্ষকদের সম্বন্ধে কিছু বলুন যারা আপনার দাওয়াতী দৃষ্টিভঙ্গি ও যাত্রায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এ প্রসঙ্গে যার দ্বারা আমি সবচে' বেশি প্রভাবিত হয়েছি, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র পথের দা'ঈদের অন্যতম ইমাম হযরত মাওলানা ইলয়াস কান্দলভী (র)। তাঁরই সন্তান হচ্ছেন 'হায়াতুস সাহাবা' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দলভী (র)। এ ব্যক্তি মনে হয় যেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশিত। রেসালত বা ওহীর মাধ্যমে এ রকম কিছু ঘটেছে বলে আমি বলছি না। তবে তিনি এ মহান দাওয়াতী কাজের জন্যে আল্লাহ্র নির্ধারিত তথা বিশেষ তাওফীকপ্রাপ্ত বলেই মনে হয়। দাওয়াতের মহান চিন্তাটা তাঁর মাথায় জেকে বসে প্রথমে। অতঃপর ধীরে ধীরে এ কাজের মধ্যে তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। তিনি মানুষকে আহ্বান করলেন, জনগণের সাথে সরাসরি মিশে দীনের কাজ করতে হবে, তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিতে হবে, দীনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম কী জনগণকে তা বুঝাতে হবে। তিনি নিজে প্রাণান্ত মেহনত করলেন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে। ইসলামী শরীয়ত অনুবর্তী হওয়ার জন্যে এবং ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে জীবন চলার জন্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এক সময় তাঁর এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। শুধু ভারত নয়; বরং গোটা এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে এ দাওয়াত। অতঃপর ধীরে ধীরে তা ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এখনো এ দাওয়াতী কার্যক্রম পুরো তৎপরতার সাথে অব্যাহত আছে সর্বত্র। পৃথিবীতে যেসব দাওয়াত মানব সমাজে সবচে' বেশি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, জগতে সুফল বয়ে এনেছে......তার মধ্যে হযরত মাওলানা ইলয়াস (র) এর দাওয়াতী কার্যক্রম অন্যতম।[১]

পূর্ণাঙ্গ ইসলাম চর্চার মাধ্যমে এ দেশের সম্মান বাড়াতে হবে

ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহ্র শোকর আদায় করুন। কত বড় দেশ আপনাদেরকে আল্লাহ্ দান করেছেন! এদেশ সম্পর্কে কুদরতের ফয়সালা এই, ইসলামের মাধ্যমেই এদেশ সম্মান ও গৌরব লাভ করবে, কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মসজিদে নবীর মিম্বরের প্রতিনিধিত্বকারী আপনাদেরকে এ মসজিদে মিম্বরে বসে বলছি, এ দেশের

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া' : ১৩৩৮ নং সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

সুখ-শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্ না করুন, যদি এ দেশ কখনো আল্লাহ্‌প্রদত্ত নেয়ামতের ব্যাপারে কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে কিংবা এ দেশের মানুষ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে ছেড়ে অন্য কোন রজ্জু আঁকড়ে ধরতে চায়, তবে এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও বাইরের কোন সাহায্য ও ছত্রছায়াই এ দেশকে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বন্ধুগণ!

সেই স্বাথে এ কথাও মনে রাখবেন, মুসলমানদের কাছে আল্লাহ্‌র দাবি এই, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।" [বাকারা ঃ ২৩৮]

মাথাকে মসজিদে ঢুকিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বাইরে রেখে দিলে একথা বলা যাবে না, আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ্ পাকেরও দাবি হলো, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। আক্বীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী আহকাম ও বিধি-বিধান, ইসলামী আইন ও সমাজব্যবস্থা এবং ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন-এক কথায় গোটা ইসলামে'র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র তখই শুধু আল্লাহ্‌র দরবারে আপনার ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো 'আস্‌লিম্' অর্থাৎ 'হে ইবরাহীম! পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো।' তখন সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন, 'আস্‌লাম্‌তু লিরাব্বিল আলামীন' অর্থাৎ 'রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র দরবারে আমি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম।' আপনাকেও আমাকেও ইবরাহীমের মিল্লাতভুক্ত হওয়ার সূত্রে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভাই ও বন্ধুগণ!

আল্লাহ্‌র রহমতের ছায়াতলে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে দেখুন, আকাশ থেকে নেয়ামত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা কীভাবে নেমে আসে।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে নিত তা হলে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বরকত ও প্রাচুর্যের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিত।" [আরাফ ঃ ৯৬]

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, ইসলামের সাথে এ দেশের ও রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ জাতির সম্পর্ক চির অটুট থাকুক। রিযিক, নেয়ামত, বরকত ও প্রাচুর্যের অফুরন্তধারা এ জাতির ওপর বর্ষিত হোক। সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করুক সবার মাঝে।[১]

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৪৮-৪৯।

সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে

বন্ধুগণ!

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা, তাতারী জাতি এক সময়ে গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিল, সুদীর্ঘ ছয় শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী হারুনুর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিল, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসল! এক সময় আলমে ইসলামীর জন্য যারা ছিল মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তীকালে তারাই হলো ইসলামের মুহাফিজ, রক্ষক। কীভাবে এটা সম্ভব হলো? কী কী কার্যকারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল? কোন উর্ধ্বশক্তি ইসলামের সামনে এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তিমদমত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিল? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন, যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদেরকে খুঁজে পেতে হবে।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিল। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কমতি ছিল না। সৌর্যবীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিল না। কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সহজ সরল, বিলাসীতাহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্যসম্ভার ছিল না তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন ধারণা ছিল না তাদের। ছিল না কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটিকতক উদ্ভট আইন-কানুন ছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এমনকি যে ভাষায় তারা কথা বলত সে ভাষার কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিল না তাদের কাছে। এক কথায় সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা ছিল একেবারেই শূন্যহস্ত। তাদের কাছে না ছিলো ভাষা ও সাহিত্য, না ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি, আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন। মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন আর শেখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিল অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ্‌র ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম, ভালোবাসা, ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়াল, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির ওপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য লাভের

মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামী কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত, সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশলা সংগ্রহ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এমন দেওলিয়া জাতি কোন দিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরি উক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নজীর রয়েছে।[১]

চিন্তা ও বুদ্ধির উত্তম চাষাবাদ স্বদেশের মাটিতে হতে হবে

একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্তান ও মিসরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল ইউরোপ, ক্যাম্ব্রীজ, অক্সফোর্ড কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশী আমদানী করুন, খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, কলকজা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানী করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানি করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ আপনাদেরকে অনুকরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আপনারা ইমাম হন। সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক, ধর্না দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায়

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৫১-৫৩।

নেই। যতদিন আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাঙ্গন আমাদের সামাজিক ও জাতীয় তথা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে না আসবে, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন না করবে, ততদিন সেগুলোর ওপরও ভরসা করার উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।[১]

আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুন

বস্তুত আর্তমানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই খৃস্টান মিশনারীরা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে, সেহেতু চিকিৎসাপ্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাঁড়ায়, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে, আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাও এক ধরনের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্তমানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। খেদমতে খলকের ইসলামী আদর্শ সমাজের বুকে পুনরুজ্জীবিত করা, যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্ততঃপক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদেরকে বলব। প্রথমত শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর রেযামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ, আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন, আপনারা ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বরং আমার ফতোয়া এই, আপনারা ইবাদতে ও সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।' আরও ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ্ পাক বান্দার সাহায্যে রত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।' হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, 'কিয়ামতে আল্লাহ্ পাক একদল লোককে লক্ষ্য

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৫৫।

করে বলবেন, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। তারা বলবে, হে মহামহিম আল্লাহ! তুমি কীভাবে অসুস্থ হতে পারো? ইরশাদ হবে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদি তাকে দেখতে যেতে, তবে আমাকেও সেখানে পেতে। বলুন, এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা স্বার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কোন একদিন তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততঃপক্ষে এ বিশ্বাস তাঁদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন শেফাদানকারী। ঔষধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ্য মাত্র। আল্লাহ্র নির্দেশেই ঔষধ তার ক্রিয়া করে। ঔষধের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এরপর যখন রোগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মজবুত হবে।[১]

আপনাদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে

প্রিয় বন্ধুগণ!

আমি আপনাদেরকে মিশরবিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আস (রা)-এর একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিল তাহযীব-তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামল ভূখণ্ড। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস (রা) কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশমাত্রও ছিল না তাঁর অন্তরে। কেননা, তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা ও নবুওয়তের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিল আলোকউদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা ও সাহাবীসুলভ অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন 'আন্তুম ফী রিবাতিন দায়িম'। দেখো, মনে রেখো, মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ ভাণ্ডার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশের তাহযীব-তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেন কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্মবিমোহিত হয়ে না পড়। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখো, তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করছ। একথা

১. আল্লামা নদভী (রহ) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৫১-৫৬-৫৭।

ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ কর না যে, তোমরা কিবতীদের ওপর বিজয় লাভ করেছ কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছো। একথাও মনে করো না, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ো না। 'আন্তুম ফী রিবাতিন দায়িম'। এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছ যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছ। এক মহোত্তম চরিত্রের আহ্বান নিয়ে তোমরা এখানে পদার্পণ করেছ। মুহূর্তের গাফলতি ও দায়িত্ববিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধূলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন-দর্শন থেকে চুল পরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদীনার পুণ্য মাটিতে নবুওয়তের পবিত্র সাহচর্যে লাভ করেছ, তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিসরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে, তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাক, সম্পদ উপার্জন, বিলাসী জীবন-যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশ ভূমি ছেড়ে মিশরে এসেছ, তবে এ দেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহীহ সালামতে ফিরে যেতে পারবে না।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক, যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না, বিজয়ী আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন, তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের, বিশেষত তোমাদের এ দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! আপনাদের মনে রাখতে হবে, 'আন্তুম ফী রিবাতিন দায়িম'। আপনারা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছেন। মুহূর্তের অসাবধানতা আপনাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।[১]

কাঁটার বদলে আমাদের ফুল ছিটাতে হবে

মানব জাতি ও মানবতার ইতিহাস তুমি খুলে দেখুন, দেখবেন বারবার এমনই হয়েছে। দ্বিপদ মানুষ রক্তপিপাসু হিংস্র চতুষ্পদে পরিণত হয়েছে যখন, তখন আল্লাহ পাকের কোন নবী-পয়গাম্বর শুভাগমন করে সে হিংস্র জিঘাংসাবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে কামিল ইনসান বা পরিপূর্ণ 'মানুষে' পরিণত করেছেন। ডাকাত -লুটেরাদের বানিয়ে দিয়েছেন পাহারাদার, হিংস্র পশুকে করেছেন পশুপালের রাখাল। নিরক্ষর অ, আ, ক, খ- তে অজ্ঞ ও মানবতার অপরিচিতদের গড়ে তুলেছেন নৈতিকতার শিক্ষক ও আইন প্রণয়নকারীরূপে। কবির ভাষায় :

'মুক্তা বর্ষণে তোমার বিন্দু হলো বিশাল বারিধি সমান,
হৃদয়ে জ্বালালে নূরের মশাল, নয়নে করিয়ে দৃষ্টিদান"।

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা : ৫৮-৫৯।

পথহারা ছিল যারা, তাদের করিলে দিশারী জগতের;
পরশদৃষ্টি তব মুরদারে বানাল জীবনদাতা।'

অর্থাৎ তোমার পরশে সংকীর্ণতা উদার হলো, আঁধার মনে আলো উদ্ভাসিত হলো, কল্যাণদৃষ্টি উন্মোচিত হলো, ভ্রান্তরা পথ-প্রদর্শক হলো আর মৃতরা হয়ে গেল অন্যদের ত্রাণকর্তা।

আমাদের এই উপমহাদেশেও যেটুকু মায়া-মমতা ও মানবপ্রেম আজও অবশিষ্ট রয়েছে, তা সেই মনীষী সূফী-দরবেশগণেরই ঋণ ও অবদান, যারা ছিলেন মুহাব্বত ও মানবপ্রেমের পয়গাম বাহক। মাহবুবে ইলাহী (আল্লাহর প্রিয়) হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র) বলেছেন, দেখ কেউ তোমার জন্য পথে কাঁটা রেখে দিলে (তোমাকে নির্যাতন করলে) তুমিও যদি বিনিময়ে কাঁটা রেখে দাও, দুর্ব্যবহার কর, তা হলে তো কাঁটার ছড়াছড়ি হয়ে যাবে, জুলুমে দেশ ছেয়ে যাবে। আর তোমার বিপক্ষের কাঁটা রাখার জবাবে যদি তুমি ফুল দিতে পার, তা হলে ফুলে ফুলসজ্জা হয়ে যাবে পৃথিবী। প্রেম ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে। সুতরাং কাঁটার ঔষধ কাঁটা নয়; কাঁটার প্রতিষেধক হচ্ছে ফুল। আর একবার তিনি বলেছিলেন, বাঁকার সাথে বাঁকা, সরলের সাথে সরল আচরণ করা; সোজার সাথে সোজা, ভালোর সাথে ভালো, মন্দের সাথে মন্দ, মিষ্টি দিলে মিষ্টি, তিতার বদলে তিতা–এই হলো সাধারণ রীতি। কিন্তু আমাদের নীতি হলো সরলের সাথে সরল এবং গরলের (বাঁকার) সাথেও সরল।

অর্থাৎ– ভালোর সাথে ভালো, মন্দের সাথেও ভাল করা। হাদীসে পাক ইরশাদ হয়েছে–

'তোমার সাথে (আত্মীয়তা) বিচ্ছিন্নকারীকে জুড়ে রাখ, তোমার প্রতি অবিচারীকে ক্ষমা কর এবং তোমার সাথে যে অসদাচরণ করে তার সাথে সদাচরণ কর।'

খাজা-ই বুযুর্গ হযরত মঈনুদ্দীন চিশতী (র)-এবং তারও আগে এ দেশে শুভাগমনকারী বুযুর্গদের মাঝে হযরত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাজবীরী (র) থেকে শুরু করে এ সিলসিলার যথার্থ উত্তরাধিকারীগণের মাঝে যার জীবন চরিত্রই দেখুন না কেন, সর্বত্রই সবার কাছে পাওয়া যাবে প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মহব্বতের সবক। মর্মাহত হৃদয়ে সমবেদনার প্রলেপ, মানবতা থেকে নিরাশ হওয়া মুমূর্ষু মানবগোষ্ঠীকে সান্ত্বনা দান, সহমর্মিতা ও বেদনার সাম্য সৃষ্টি করা ছিল তাদের জীবনব্রত। তারা এ সকল হাসিল করেছিলেন নবীগণের পয়গাম, তা'লীম ও জীবন-চরিত্র থেকেই। নবী চরিত্রের ব্রত গ্রহণ করেই তারা বেরিয়ে পড়েছেন দেশে দেশে। মানবতার সে পাঠ শিখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। প্রেম ও মুহাব্বত দিয়েই তারা জয় করেছেন বিশ্ববাসীর হৃদয়। কবির ভাষায় ঃ

'মনের ওপরে রাজত্ব করেন যিনি, তিনিই তো যুগ বিজয়ী।'

তারা আত্মপ্রেমে বিভোর ছিলেন না। তাদের প্রতি আত্মকেন্দ্রিকতার অপবাদ হবে জঘন্য অবিচার। আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা সহজে অন্যকে আঘাত হানতে পারে। দরবেশ-সূফীগণ ছিলেন পর কল্যাণে নিবেদিত। তারা প্রতিপক্ষকে আঘাত হানতেন না। আঘাত তো হেনে থাকে তীর, কামান, বর্শা ও তরবারিধারীরা। তারা তো মানুষের অন্তর জয় করতো অমিয় বাণী ও মধুর আচরণে। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াত, লোকেরা তাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, বংশীয় মুরুব্বী ও রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের তুলনায় এ আত্মিক সম্পর্কওয়ালাদের প্রাধান্য দিতেন। তাদের জন্য উৎসর্গ করতেন জান মাল ও সহায়-সম্পদ।[১]

চাকরিজীবী ভাইদেরকে বলছি

উৎসর্গ, ত্যাগ ও সেবার মনোবৃত্তি জনপ্রিয়তা বিধায়ক গুণাবলী। হুকুমত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও এর অনুগমন করে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সহযাত্রী; বরং এর সেবক হয় এবং তাতে সে গর্ববোধ করে। এসব গুণ অর্জন না করে ক্ষমতাপ্রাপ্তি কিংবা পদমর্যাদার কোন ভরসা নেই, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটকৌশল ও বুদ্ধিমত্তার কোন নির্ভরতা নেই। আজকের অপরিহার্য প্রয়োজন হলো, মুসলিম তরুণ সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রমাণ পেশ করা। কর্মদক্ষতা, পারদর্শিতা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী অধিক পরিমাণে আমাদের মাঝেই বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের চরম অর্থাভাব ও অনটনকালেও যদি কেউ লাখ টাকা ঘুষ দিতে চেষ্টা করে, তা হলে তা স্পর্শ করা আমরা হারাম মনে করব; বরং ঘুষের প্রস্তাবকারীকে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারব, আপনি আমার, আমার কওম ও মিল্লাতের মর্যাদাহানি করেছে। আপনার এ দিকে লক্ষ্য হলো না, কোন মুসলমান ঘুষ নিতে পারে না! এ আচরণের সময় মুসলিম তরুণের মুখাবয়বও এরূপ ঘৃণা ও ব্যথার অভিব্যক্তি পেশ করবে যেন কেউ তাকে গালি দিয়েছে। কোন মুসলমান জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই এবং যে কোন বিভাগেই কর্মরত থাকুক না কেন, সে হবে কর্ম ও নীতির আদর্শ। বাস্তব কর্ম দ্বারাই সে প্রমাণ করবে, কোন ব্যক্তি, দল ও সংগঠন; বরং সরকারও তাকে কিনে ফেলতে পারে না।

মোটকথা, মিল্লাতের বিশেষ ও নিজস্ব সমস্যার সমাধান কর্ম অবদানেই নিহিত। মর্যাদাশীল মিল্লাত হিসাবে মুসলমানদের টিকে থাকার পথ ও পন্থা এতেই সীমিত। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ 'আল্লাহ পাক কোন বিদ্যমান অবস্থা ও অর্জিত মান-মর্যাদা, শান-শওকত ক্ষমতা ও রাজত্ব পরিবর্তিত করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন নিজেরাই সাধন করে।' (রা'দ ঃ ১১)

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৮-৮০।

আমরা ক্ষমতা হারিয়েছি আমাদের ভুলের পরিণতিতে। আমাদের অধিকার ও নির্ভরযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছে আমাদের বিচ্যুতির মাশুল হিসেবে। তার পুনঃপ্রাপ্তি নির্ভর করে যোগ্যতা অর্জনের ওপরেই। দুনিয়ার কোন শক্তির সাহায্য-সমর্থন তাতে কোন সুফল ফলাবে না।[১]

দীনী শিক্ষিতদের বলছি

আল্লাহ্র ফজলে আপনারা শুধু ইলম ও জ্ঞানের অধিকারীই নও; বরং আল্লাহ্ পাক আপনাদের অধিষ্ঠিত করেছেন দীনের নেতৃত্বের আসনেও। আর তাই এ অবকাশে আমি দু'টি মৌলিক তথ্যের ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু আরয করার কামনা রাখি।

এক. আকাইদ, দীনের আদর্শ, নীতিমালা ও শরীয়তের মূলবিধি সম্পর্কিত বিষয়। এ ব্যাপারে আলেম সমাজ অবিচল থাকবেন। হুবহু দিকদর্শক যন্ত্রের ন্যায়। ব্যক্তি যত অধিক প্রভাবশালীই হোক না কেন, দিকদর্শক তার পরোয়া না করে নির্ভুল দিক নির্দেশ করবেই। শরীয়তের মূলনীতি ও বিধিমালার ব্যাপারো অনুরূপ। এখানে অবকাশ নেই কোন প্রকার ঢিলেমি বা নমনীয়তার। হিকমত ও কুশলতা ভিন্ন ব্যাপার। আর শিথিলতা ও নমনীয়তা ভিন্ন ব্যাপার। কুশলতা ও শিথিলতার মাঝে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। সত্য কথাও তো মানুষ প্রজ্ঞা ও কুশলতার সাথে প্রকাশ করতে পারে। তবে তার পদ্ধতি অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞ কুশলতাসুলভ। আল-কুরআনে নির্দেশ রয়েছে ঃ 'আহবান কর তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমত ও কল্যাণকর উপদেশের মাধ্যমে। (বনী ইসরাঈল ঃ ১১৫)

আলেম সমাজের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো মুসলিম জনতাকে জীবনের বাস্তবতা, দেশের পরিস্থিতি ও পরিবেশ-পরবর্তী চাহিদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর প্রদান করে তাদের সদা অবগত ও সতর্ক রাখা। আলেমদের প্রচেষ্টা সব সময় অব্যাহত থাকবে যেন দীনের সাথে সমাজের সম্পর্ক কখনো ছিন্ন না হয়। পরিবেশ ও জীবনের সাথে দীন ও মুসলিম সমাজের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এবং খেয়ালী ও কাল্পনিক জগতে তারা বিচরণ করতে শুরু করলে দীনের আওয়াজ তার প্রভাব ক্রিয়া হারিয়ে ফেলবে; আলেমগণ তাদের দাওয়াত ও ইসলাহী সংস্কারের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবেন না। শুধু এ পর্যন্তই নয়; বরং দীনের বাহকদের পক্ষে এ দেশে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই দেয়, যেখানে আলেমগণ অন্য সবকিছু করেছেন, কিন্তু উম্মতকে জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করেননি, পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করেননি, একজন সুনাগরিক ও রাষ্ট্র সমাজের একটি প্রয়োজনীয় ও ফলদায়ক অঙ্গরূপে গড়ে

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-৮৪।

ওঠার, দেশ ও জাতির নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেননি, সে দেশ, সে সমাজ ও জাতির মুখের (বিস্বাদ) গ্রাস উগড়ে দেয়ার মতই অমন লোকদের উৎখাত করে দিয়েছে, উগড়ে দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেছে; কারণ তারা নিজেদের জন্য অবস্থান, ক্ষেত্র ও টিকে থাকার ব্যবস্থা করে রাখেনি। আজ উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন এমনই দূরদর্শী বুদ্ধিদীপ্ত ও বাস্তবপন্থী ধর্মীয় নেতৃত্ব, যার প্রভাবে সমাজ বাস্তবমুখী হবে এবং যে নেতৃত্ব নিজের জন্যে স্বতন্ত্র আসন গড়ে তুলবে।[১]

নিজেকে চেনো, সময়কে বুঝুন

বন্ধুগণ!

সময়ের হাতে শিক্ষা লাভ করার আগে নিজেই শিক্ষা গ্রহণ করুন। যামানার বে-রহম হাকীকত ও নির্দয় সত্য তোমার চোখ খুলে দেয়ার আগে নিজেই চোখ মেলে আলোর ইশারা দেখার এবং চারপাশের পৃথিবীর অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন। দেখুন, যামানার ইনকিলাব হঠাৎ আপনাকে কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে? কোথায় মাওলানা নানুতুবী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী এবং মাওলানা শিবলী নোমানী (র)-এর যুগ, আর কোথায় প্রযুক্তির চমকে ধাঁধিয়ে দেয়া নয়া জাহিলিয়াতের যুগ! আপনার এখনো সময় ও সুযোগ আছে, হিম্মত ও মনোবলের সাথে নিজেদের চিন্তার বিনির্মাণে এবং আখলাক ও চরিত্র গঠনে আত্মনিয়োগ করুন এবং আসাতেযায়ে কেরামের হেদায়াত ও পথনির্দেশনা গ্রহণ করুন, যাতে মাদরাসার সীমাবদ্ধ জগত থেকে যখন জীবন ও কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনে প্রবেশ করবেন, তখন নির্ভয়ে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন এবং চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিরও মোকাবেলা করতে পারেন।

আপনাদের জামাতে, এই জীর্ণ বস্ত্র ও শীর্ণ দেহের মাঝে ঘুমিয়ে আছে এক জীবন্ত সিংহ। আপনাদেরই মাঝে লুকিয়ে আছে এমন ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এমন নিবেদিত প্রাণ খাদেমে মিল্লাত ও রাহবারে উম্মত যাদের খবর আপনি জানেন না! আপনার শিক্ষক-সঙ্গীরাও জানেন না। সেই সুপ্ত প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে আমি আমার এই কমজোর আওয়াজে ডাক দিয়ে গেলাম। হায়! যদি তা আপনাদের হৃদয়ের গভীরে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারতো! ঈদের নও হেলালকে সম্বোধন করে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, আমি আপনাদের সম্বোধন করে বলি 'বর খোদ নযরে কুশা'জ তেহী দামনে মরঞ্জ, দর সীনায়ে তূ মাহে তামামে নাহা দাহ আন্দ।' অর্থাৎ নিজের শূন্য হাত দেখে কেন ক্ষুণ্ন আপনি! আপনার বুকে তো লুকিয়ে আছে পূর্ণ চাঁদ।'[২]

১. আল্লামা নদভী (র) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৯০-৯৪।
২. আল্লামা নদভী (র) বিরচিত 'পা জা সুরাগে জিন্দেগী' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৯-১৫০।

দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে 'আসহাবে কাহফ' তথা গুহাবাসীদের চমকপ্রদ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। সমকালীন স্টাইল ও ধারায় এর শিরোনাম করা যায়-'দুঃসাহসী সাত তরুণের কাহিনী' (কারণ, মুফাসসিরে কিরাম তাদের সংখ্যা সাত হওয়ার উপর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।) এ কাহিনীতে মানব বংশধরদের তরুণ গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে এক বিশেষ পয়গাম ও উন্নত আদর্শ, যে পয়গাম ও আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন, যার প্রতিক্রিয়া শুধু মনমস্তিষ্ককেই প্রভাবিত করে না; বরং তা প্রতিভা, সাহসিকতা, উদ্যম ও সংকল্পের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা সঞ্চারে কার্যকরী হতে পারে। এ কাহিনী কখনো হৃদয় সিক্ত করে শিশির বিন্দু ঝরিয়ে, কখনো আঘাত হানে ফুল ও পাপড়ির চাবুক হয়ে। আমিও আজ তরুণদের কাছে তরুণদের কাহিনীই শোনাতে চাই। বস্তুত আমি শোনাচ্ছি না, বরং আল-কুরআনই তা শোনাচ্ছে। আল-কুরআনই তাদেরকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে তাদের চিরস্মরণীয় করে দিয়েছে সর্বযুগের জন্য। তাদের সমাসীন করেছে 'আইডিয়াল' ও অনুসরণীয় আদর্শের আসনে। কাহিনী বিবৃত হয়েছে সহজ ভাষায়, সাবলীল ভঙ্গীতে ও সংক্ষেপে। কিন্তু তা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও গভীর। ইরশাদ হয়েছে ঃ

'ওরা একদল তরুণ, যারা তাদের রবের ওপর ঈমান এনেছিল। আর আমি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাদের সৎ পথে চলার শক্তিকে। তাদের চিত্ত দৃঢ় করে দিয়েছিলাম যখন তারা (ঈমানের পথে চলতে) উদ্যত হলো এবং বলল, আমাদের রব তো (তিনি, যিনি) আসমান ও যমীনের রব, আমরা কখনো তাঁকে ব্যতীত কোন মা'বুদ (প্রতিমা)-কে ডাকব না ('ইবাদত করব না)। কেননা তা হলে তো আমরা অবশ্যই অন্যায় উক্তি করার অপরাধ করে ফেললাম।" [সূরা কাহাফ ঃ ১৩-১৫]

এ কাহিনীর পটভূমি নিম্নরূপ ঃ ইতিহাসখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শামের ফিলিস্তিন এলাকায় একটি নতুন দাওয়াতের সূচনা হয়েছিল। তখন এ দাওয়াতের বাহক ছিলেন সায়্যিদুনা হযরত 'ঈসা মসীহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম। আমরা মুসলমানরাও তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি। তিনি দাওয়াত দিলেন তাওহীদের, একত্ববাদের। সারা বিশ্ব তখন শিরক ও অনাচারের আঁধারে নিমজ্জিত। নিশ্ছিদ্র আঁধারের বুকে ক্ষীণ আলোর রশ্মিরূপে উদ্ভাসিত হলো এক নতুন পয়গাম। হযরত 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম একটি ধ্বনি উচ্চকিত করলেন। শিরক, বংশ পূজা তথা সাম্প্রদায়িকতা, প্রথা পূজা, কুসংস্কার, বস্তুবাদ ও মানবতার নির্যাতন শোষণের বিপরীতে তাওহীদ ও আল্লাহ্ পাকের নির্ভেজাল ইবাদতের ওপরে রচিত হয়েছিল তাঁর পয়গামের মূল ভিত্তি।

কতক মানুষ তাঁর এ দাওয়াত কবুল করে তার ধারক বাহকে পরিণত হলো। নতুন ব্রত নিয়ে তারা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ল এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে দাওয়াত প্রচারের উদ্দেশ্যে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী সন্নিকটে উপনীত হয়ে সেখানে দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করল। এখানেই ওই তরুণদের ঈমান আনার কাহিনী তৈরি হয়।

পৃথিবীর বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অভিজ্ঞদের তুলনায় জীবনী শক্তিতে উচ্ছল তরুণরাই নতুন ফলপ্রসূ আহ্বানে অধিকতর দ্রুত সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞতা, লাভালাভ চিন্তা, প্রথা-সংস্কার ও আশা-নিরাশা বয়স্কদের পথে বড় অন্তরায় ও বিপত্তি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে তরুণরা হয় সম্পর্ক, বন্ধন ও আসক্তির (Altachment) বেড়াজাল থেকে মুক্ত। তাই বিপ্লবী কর্মসূচীতে তরুণরাই বয়স্কদের তুলনায় অধিক উচ্ছল ও অগ্রগামী। তারা সামান্য ধাক্কায় সকল পারিবারিক বন্ধন ছিঁড়ে এগিয়ে চলে সম্মুখ পানে।

আল-কুরআন এই তরুণদের নির্দিষ্ট কোন বয়সের কথা উল্লেখ করেনি এবং এটাই আল-কুরআনের প্রকাশভঙ্গী। কেননা যদি বলা হতো, তারা ছিল ১৮-১৯ বছরের তরুণ। তা হলে এর চেয়ে অল্পাধিক বয়সের লোকেরা এ অজুহাত সৃষ্টির অবকাশ পেয়ে যেত, একথা আমাদের জন্য বলা হয়নি। এজন্য আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'ইন্নাহুম ফিতয়াতুন' ওরা তরুণদের একটি ছোট দল। আরবী ভাষায় অভিজ্ঞরা জানেন, 'ফিতয়াতুন' শব্দে বয়সের তারুণ্যের সাথে সাথে মন-মেধা-মস্তিষ্ক, উচ্চাভিলাষ ও সংকল্পের তারুণ্য ও উচ্ছলতার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

তরুণ দল পৌঁছে গেল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে, যেখানে পত পত করে উড়ছে পরাক্রমশালী রোমান পতাকা। সে সাম্রাজ্যটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের সর্বাধিক সুসংহত, সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে উপনীত হওয়ার গৌরবদীপ্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সে সাম্রাজ্যটি উন্নততর আইন ও শাসনতন্ত্রে শাসিত পৃথিবীর বুকে সর্বাধিক বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও শাহানশাহীরূপে স্বীকৃত। এই সাম্রাজ্যটি ও তার সম্রাটদের নাকের ডগায় সরাসরি মুখের ওপরে জনসমুদ্রের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এই নগণ্য সংখ্যক তরুণ স্লোগান তুলল। নিজেদের সত্য ধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে তার প্রচারে ব্রতী হলো। কী অদম্য সাহস ও উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল সে তরুণ হৃদয়গুলো! তাদের গৃহীত মতবাদ ছিল তখনকার বিশুদ্ধ মাযহাব, সে যুগের খাঁটি ইসলাম। কেননা খ্রিষ্টবাদ তখন পর্যন্ত ছিল ভেজাল ও বিকৃতিমুক্ত। আহ্বায়ক দল, হযরত 'ঈসা আলায়হিস সালামের পয়গামের একনিষ্ঠ পতাকাবাহী দল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হয়ে ঘোষণা দিল; আমাদের রিযিকদাতা, আমাদের প্রতিপালন ও জীবন ধারণের ব্যবস্থাপক হুকুমত নয়, সম্রাট নয়।

আমাদের রিযিকদাতা প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ্। কুরআনের ভাষায়- 'আমাদের রব (তিনিই, যিনি) আসমানসমূহ ও যমীনের রব-মালিক। আমরা কখনো তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে মা'বুদ সাব্যস্ত করে ডাকব না। (তেমন করলে তো) আমরা তখন অন্যায় অযৌক্তিক কথা বলে ফেলতাম। এই যে আমাদের কওম (স্বগোত্র), এরা তাকে বর্জন করে আরো অনেক পূজনীয় সাব্যস্ত করে রেখেছে। এরা ওদের ব্যাপারে কোন স্পষ্ট প্রমাণ কেন পেশ করছে না? সুতরাং আল্লাহ্র নামে যারা মিথ্যা আরোপ করে, তাদের চেয়ে অধিক অনাচারী আর কে?' [সূরা কাহফ ঃ ১৪-১৫]

এ বিবরণে আল-কুরআন আর একটি তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছে। তা হলো, সফলতা লাভের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের। দাওয়াতের বাহকদের সাহসিকতায় ভর করে প্রথম পদক্ষেপ মানুষের পক্ষ থেকেই হলে আল্লাহ্ পাকের মদদ এগিয়ে আসে তার সহায়তায়। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ 'আমানূ বিরাব্বিহিম ওয়া যিদনা হুম হুদা' (তারা তাদের কর্তব্য পালন করে অগ্রগামী হলো, তারা তাদের রব এর ওপরে ঈমান আনল আর (আমার মদদ তখন সাব্যস্ত হলো) আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিলাম। অন্য এক আয়াতে রয়েছে-'ওয়াল্লাযীনা জাহাদূ ফী না লানাহ্দিয়ান্নহুম সুবুলানা' অর্থাৎ 'আমার (দীনের) পথে যারা সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদের হিদায়াত দেব আমার পথের।'

মানুষ যদি এ প্রতীক্ষায় থাকে, কোন বিষয়ে কোন বাণী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে কিংবা তাদের কণ্ঠহার হয়ে যাবে, তবে তা হবে ভুল। প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হবে নিজেকেই, হিম্মত ও সাহসিকতার সূচনা করতে হবে পথ চলার, তবেই হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে মহান রাব্বুল আ'লামীনের মদদ ও সহায়তা। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ 'ওয়ারাবাতনা আলা কুলূবিহিম' (তার অগ্রগামী হলো)। আমি তাদের মনের জোর ও উদ্যমকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করলাম। কারণ আমি জানতাম, সে যুগের পরাশক্তি ও পরাক্রমশালী সরকার ও সম্রাটদের সাথে ছিল তাদের প্রতিযোগিতা। তারা নিয়েছিল সরকারী মতবাদ ও ধর্ম বর্জন করে একটি নতুন দীনের দীক্ষা।

এটাই আল-কুরআনের বর্ণিত আসহাবুল কাহফ (গুহাবাসী)-এর ঘটনা। জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফরকালে (১৯৭৩) আমার সে গুহা দেখার সুযোগ হয়েছে, যে গুহায় তারা আরামে ঘুমুচ্ছেন। জর্দান প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মহাপরিচালক গবেষক বন্ধুবর ওয়াফা আদ-দাজ্জানী সাথে থেকে আমাকে সে গুহা পরিদর্শন করিয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা সে গুহাটিই আসহাবুল কাহফের আলোচ্য গুহা হওয়া প্রমাণিত করেছেন।

সূরা কাহফে বিবৃত তরুণদের জীবনকর্মে জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বিপদসংকুল কর্ম প্রান্তরে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও আশা-বাসনা জলাঞ্জলি দিলেই কোন জাতি রক্ষা পাবে বিপর্যয় ও বিনাশের চরম হুমকি থেকে। আর একটু সাহসিকতা ও উদারতা নিয়ে অগ্রগামী হলে আশা পোষণ করা যাবে মানবতার কল্যাণ সাধনের। কবি আকবর ইলাহবাদী যথার্থই বলেছেন ঃ

'নায কেয়া ইস পে জো বদলা হ্যয় যামানে তুমে,
মর্দ ওয়হ হ্যয় জো যামানে কো বদল দেতে হ্যয়।

"যুগের স্রোতে ভেসে চলেছে, এ নয় গৌরব আপনার; কালের প্রবাহ রুখে দেয় যে পুরুষ, তারই মাথায় পরাও গৌরব মুকুট।"

অর্থাৎ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। যুগধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানব কল্যাণে প্রবাহিত করাই পৌরুষদীপ্ত তরুণের অবদান।[১]

হে তরুণ, শোন, স্পেন কেন আমাদের হাতছাড়া হলো !

আওরঙ্গাবাদকে আমি 'ভারতের গ্রানাডা' নামে উল্লেখ করে থাকি। ইতিহাসবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমার এ উপমার রহস্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কেননা উভয়ের (স্পেনের গ্রানাডা ও ভারতের আওরঙ্গাবাদ) মাঝে গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গ্রানাডায় ছিল আরবী ইসলামী হুকুমত, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গোটা ইউরোপে ইসলামের ডংকা বাজিয়েছে। গোটা ইউরোপ ছিল তার প্রভাবের সামনে নতজানু। তার অবদান কৃপা থেকে ইউরোপ কোনদিন নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। ইউরোপকে সে যা দিয়েছে, তা আক্ষরিক অর্থেই অনেক ও অঢেল। হ্যাঁ, যদি সে সারা ইউরোপকে ইসলাম সম্পদে সম্পদশালী করে দিত! এটা ছিল তার বড় ধরনের বিচ্যুতি। আর সে বিচ্যুতির মাশুলস্বরূপ আল্লাহ পাক তাদের দেশটিই ছিনিয়ে নিলেন।

আরবরা ইউরোপীয়দের দিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো। যুক্তি ও বাস্তবতার আনুগত্য ও অনুসন্ধান এবং গবেষণার পন্থা ও অভ্যাস। আধুনিক ইউরোপের উন্নতি ও অগ্রগতির পেছনে এ সবের প্রভাব ও কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। আন্দালুস তথা মুসলিম স্পেনেই ইউরোপকে 'ক্বিয়াস' ও অনুমান-নির্ভরতা থেকে 'ইসতিকরা' ও গবেষণার পথ দেখিয়েছিল। 'ক্বিয়াস' হলো অনুমানভিত্তিক অর্থাৎ মেধা ও অধ্যয়নের বলে কোন মূলনীতি ও সার্বিক বিধি (থিওরি) স্থির করে এককসমূহকে তার সমান্তরালে নিয়ে আসা এবং এভাবে সার্বিক বিধি থেকে কোন বিশেষ এককের মান ও অবস্থান নির্ণয় করা। আর 'ইসতিকরা' হলো এককগুলো

১. আল্লামা নদভী (র.) এর বক্তৃতা সংকলন 'প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১০৮-১১৯, ঈষৎ সংক্ষেপিত।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ নিরীক্ষার পর তার সমষ্টিগত ও সার্বিক অধ্যয়নের গবেষণালব্ধ নির্যাস থেকে কোন মূল বিধি ও থিওরীতে উপনীত হওয়া, অর্থাৎ এককগুলো প্রমাণ ও সাক্ষ্য দেয়, সার্বিক ও মৌলিক বিধি এমনই হওয়া উচিত।

ইউরোপের উন্নতি-অগ্রগতি, অতিপ্রাকৃত দর্শন (তাত্ত্বিক দর্শন) বর্জন করে বিজ্ঞান-টেকনোলজি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পন্থা অবলম্বনের পেছনে ইসতিকরাও গবেষণার মূলনীতি মেনে নেয়াই কার্যকর কারণ। আর এ পন্থা মুসলিম স্পেনের ঋণ ও অবদান। স্পেন তাদের দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গ্রীক দর্শনের গবেষণালব্ধ ফলাফল। স্পেনীয়রা গ্রীক দর্শন আহরণ করে তা আত্মস্থ করার পর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছে এবং তা-ই অনূদিত হয়েছে ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায়। কিন্তু তাদের মারাত্মক বিচ্যুতি ছিল ইউরোপে বিশুদ্ধ ও মৌলিক ইসলামের প্রসার না ঘটানো। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি করলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও কথা সাহিত্যের উন্নয়নে নিমগ্ন হলেন।[১]

রাজ-ক্ষমতা আসল নয়;

চরিত্র ও স্বকীয়তার মাধ্যমেই স্থায়ী করতে হবে নিজেদের কর্তৃত্ব

রাজ্য ও রাজ-ক্ষমতা একটি মহান নেয়ামত। কিন্তু তা কোন কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বা বহনযোগ্য কোন বস্তু নয় যে, ইচ্ছা করলেই তা কোথাও থেকে বহন করে অন্য কোথাও স্থাপন করা হবে কিংবা কোথাও থেকে তুলে অন্য কোথাও লাগিয়ে দেয়া যাবে অথবা তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও শাসনাধিকার হলো বিশেষ ধরনের কর্তব্যবোধ, সৃষ্টির প্রতি সহযোগিতা, সমবেদনা, নৈতিকতা, জনসেবা ও জনকল্যাণের উদ্দীপনার একটি বহিঃপ্রকাশক্ষেত্র অর্থাৎ কোন জামাত, কোন দল বা জাতি যখন বিশেষ ধরনের স্বভাবজাত ও নৈতিক গুণাবলী ও কর্ম অবদানে সমৃদ্ধ হয়, তখন তাদের সে স্বভাব ও নীতিবোধের এ কর্ম-অবদানের বিস্তৃতি ও গভীরতার মানদণ্ডে কোন ভূখণ্ডে তাদের যোগ্যতা-পারদর্শিতা প্রকাশের অবকাশ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

'অতঃপর আমি তাদের (পূর্বসূরীদের) পরে তোমাদের পৃথিবীর বুকে খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানালাম, (উদ্দেশ্য) যাতে দেখে নিতে পারি, তোমরা কেমন আচরণ কর।' (সূরা ইউনুস ঃ ১৪)

মৌলিক বিষয় হলো, আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও বাহ্যিক আচার-অবদান অর্থাৎ এমন জীবন পদ্ধতি, যা শুধু সালতানাত ও রাজ্যাধিকার নয়, বরং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও পরিচিতি। আল্লাহ্‌র দরবারে প্রিয় হওয়ার স্বীকৃতি ও

১. আল্লামা নদভী (র.)-এর বক্তৃতা সংকলন' প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১২০-১২১।

দৃষ্টির গভীরতা, কল্যাণ দান করার মাধ্যমে হিদায়াত ও আল্লাহ পাকের অসীম রহমত প্রাপ্তির দরজা খুলে দেয়। রাজ্যাধিকার ও শাসন ক্ষমতা তো এর একটা অতি সাধারণ ও লঘু প্রতীক মাত্র। ঈমানী সীরাত ও ঈমানী নৈতিকতা হলো এমন বিষয়, যার ফলে দিকদিগন্তে ও ব্যাপক জনতার মাঝে বিস্তৃত হয় বিজয় প্রভাব, ক্ষমতা প্রদত্ত হয় মানুষের মনের ওপরে শাসন চালাবার। ঈমানী চরিত্র দান করে এমন বাদশাহী যার তুলনায় হাজার (পার্থিব) রাজত্ব তুচ্ছ ও নগণ্য। কারণ সব কল্যাণের উৎস ও প্রস্রবণ যে মূল বিষয়টি, তা সীরাত ও ঈমানী চরিত্রবল। একবার কোথাও আমি বলেছিলাম, 'সংকল্প সংগঠন জন্ম দেয়, সংগঠন সংকল্প জন্ম দেয় না"। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে সঠিক সংকল্প। ব্যক্তি ও সমষ্টির মনে সঠিক ও যথার্থ সংকল্পের উদ্ভব হলে শত শত প্রতিষ্ঠান লাভ করতে পারে। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। এই সজীব হয়, আবার এই নির্জীব ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, আবার বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের সংকল্প সঠিক ও যথার্থ রূপ ধারণ করলে, নিয়ত ও বাসনা নির্ভুল ও সঠিক হলে, মানব জীবন, স্বভাব-চরিত্র শরীয়তের কাঠামোতে গড়ে উঠলে এবং আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি সাপেক্ষ পন্থায় গঠিত হলে, মোটকথা মেধা-মস্তিষ্ক যদি সঠিক গন্তব্য, সঠিক গন্তব্যাভিমুখে এমন নির্ভুল গতিতে অগ্রসর হয় তখন তাদের তো তাদের-গোলামদের পদতলে লুণ্ঠিত হতে থাকে কিস্‌রা ও কায়সারের তাজ আর রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি হয় অবলুণ্ঠিত।[১]

দাওয়াত ও তাবলীগের পদ্ধতি

প্রশ্ন ঃ দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভারত থেকে বের হওয়া তাবলীগী জামাতের খুব নাম শোনা যাচ্ছে। তাদের মিডিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

উত্তর ঃ এ কাজটি এখন খুবই মূল্যায়িত ও ফলপ্রসু হচ্ছে সর্বত্র। যদিও তাতে আধুনিক শিক্ষিত ও যুব সমাজের মন-মানস সম্পর্কে আরো জ্ঞান-গবেষণাপূর্বক কর্মসূচী হাতে নেয়া দরকার আছে। বর্তমান যুবা-তরুণরা কী চায়? তাদের বোধ-বিশ্বাস, তাদের চিন্তা-চেতনাকে মূল্যায়ন করে প্রজ্ঞার সাথে তাদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। তাবলীগী জামাতের কর্মসূচী সীমিত। বিশুদ্ধ আক্বীদা, ফরজ-ওয়াজিবের ওপর আমল...ইত্যাদি মৌলিক বিষয়াদির ওপর তারা জোর দিয়ে থাকেন বেশি। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সংস্কার করা, নতুন প্রজন্ম এবং যুব সমাজকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারে

১. আল্লামা নদভী (র)-এর বক্তৃতা সংকলন' প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১২২-১২৩।

আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে-এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় তাদের মাঝে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন : দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র ময়দানে গোটা উম্মাহ নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন দল, জামাত জন্ম নিচ্ছে। প্রত্যেক জামাত তাদের মত করে ইসলামী বিপ্লবের প্ল্যান-প্রোগ্রাম প্রণয়ন করছে, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি হাতে নিয়ে কাজ করছে। আপনার দৃষ্টিকোণে এ কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের আদর্শ পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে এমন পদ্ধতি হাতে নিতে হবে, যার মাধ্যমে নবপ্রজন্মকে দীনের সহীহ বুঝের ওপর গড়ে তোলা যাবে, যাতে তারা দীনকে বর্তমান যুগের উপযোগী করে, যথাযথ উদার মানসিকতা নিয়ে গ্রহণ করতে পারে এবং দীনের মৌলিকত্বেও যেন কোনো আঘাত না আসে। আর কাজটা আরম্ভ করতে হবে বিবেক সংস্কারের মধ্য দিয়ে। ইসলামী মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রে ইউরোপসহ অন্যান্য বিশ্ব থেকে আগত আধুনিক যুব সমাজকে প্রভাবিত করে এমন সব মিডিয়া ও কর্মসূচীকেও অবহেলা করবো না আমরা। বর্তমান তারুণ্যে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু মাধ্যম বাহির থেকে আসলেও আমরা তা মূল্যায়ন করবো। অন্যের বলে ভালো কিছুকে অবহেলা করা উচিত নয়। আমি মনে করি, যুগোপযোগী মাধ্যমে এভাবে আধুনিক মন-মানসকে, যুব সমাজকে এবং নতুন নেতৃত্বকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে।[১]

আমাদের জাতীয় ব্যক্তিসত্বা ও জীবনাচারের দুর্বলতাসমূহ দূর করতে হবে

আমাদের জাতীয় ব্যক্তিসত্ত্বা ও জীবনাচারে এমন কিছু দুর্বলতা আছে, যা আমাদেরকে অবশ্যই দূর করতে হবে। দুর্বলতাগুলো হচ্ছে–

১. চরিত্র ও মূল্যবোধের ওপর জাগতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া।

২. আসল আন্তর্জাতিক শত্রু (তথা ইউরোপ ও ইউরোপীয় সভ্যতা)'র চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে গাফলতি করা।

৩. ভীরুতা, শঙ্কা ও দুর্বল কর্মশক্তি।

৪. ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অন্ধ অনুকরণ।

---

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া : ১৩৩৮ নং সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাতকার থেকে সংগৃহীত।

৫. প্রবন্ধ ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে অর্থহীন আবেগতাড়িত কথা-বার্তার বহুল ব্যবহার এবং এ নিয়ে পারস্পরিক অনৈক্য সৃষ্টি। ভীরুতা ও দুর্বল কর্মশক্তি বিষয়ে আমি এক জায়গায় লিখেছি,

'মুসলমানদের মধ্যে এখন বুদ্ধিবৃত্তিক পতন ও চরিত্রহীনতা জন্ম নিয়েছে। ফলে অপরের বিপদ দেখে তারা এখন আনন্দবোধ করে। অপরের ক্ষতির অপেক্ষায় থাকে তারা। মুসলমানদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও অন্তঃসারশূণ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা অপরের সাহসিকতা, বিসর্জন ও ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করার অনুভূতিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমান মুসলমানরা নৈরাশ্যের শিকার। পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তারা। নিজেদের দুর্বলতা নিয়ে অতিমাত্রায় উপলব্ধি, অন্যের শক্তি-সামর্থকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন এবং সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ট বিষয়ে অন্যায় পর্যায়ের মাখামাখি....ইত্যাদি সবই সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য রাজনীতির ফলে। অথচ এ পাশ্চাত্য জগত বর্তমান যুগে মুসলমানদেরকে একটি জড় নিস্তেজ জাতি বৈ কিছু মনে করে না। সংখ্যাই ওদের কাছে আসল মুখ্য। সংখ্যার তেলেসমাতি থেকে ওরা বের হয়ে আসতে অক্ষম।'[১]

ষড়যন্ত্রই সবকিছু নয়

প্রশ্ন : তাদের সেই উক্তি সম্পর্কে তোমার রায় কী? যারা বলেন– বর্তমান মুসলমানদের ওপর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। অতঃপর ষড়যন্ত্র মুকাবেলায় তাদের অক্ষমতার ব্যাখ্যা দেয়া হয়, তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রের ফলেই এই অক্ষমতা সৃষ্টি। অথচ ব্যাখ্যার চেষ্টা এটা করা হয় না যে, মুসলিম উম্মাহকে স্বাধীনতাই দেয়া হচ্ছে না কিছু করার–একথা তাদের বুঝা উচিত। আজ মুসলমানদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যয় হচ্ছে এ স্বাধীনতা অর্জনের পথেই। তা নয় কি?

উত্তর : আসলে মুসলমানরা আজ মারাত্মক হীনমন্যতার শিকার। নেতৃত্বের আসন থেকে ছিটকে পড়ার কারণে তাদের মধ্যে পরাজয় পরাজয় ভাব। না পাওয়ার বেদনা তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, হতাশার সাগরে নিমজ্জিত তারা। ফলে তারা আজ অল্প কিছু পেলেও ভীষণ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। কোথাও কোথাও সামান্য স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পেয়ে তারা আগে বেড়ে আর বেশি কিছু করার সাহস করতে পারছে না। অথচ এ অবস্থায় জীবন গঠন, জীবন পরিচালনা ও

---

১. আল্লামা নদভী (র.) রচিত 'ফী মাসীরাতিল হায়াত' শীর্ষক তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত, খণ্ড : ১ম, পৃষ্ঠা : ১৮০-১৮১।

ভবিষ্যত রচনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের কোনোই প্রভাব নেই। তাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, মুসলমানদের চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি ঘটাতে হবে। তাদেরকে শিষ্যত্ব ও অনুসারীর স্তর থেকে নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ এক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে দুই ধরনের চিন্তাধারা কাজ করছে। কিছু লোক মনে করেন, বর্তমান মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে একটি ষড়যন্ত্র চলছে, যে ষড়যন্ত্রের নাগপাশ থেকে তারা কোনো মতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। এজন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতাকেই তারা কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আরেকটি দলের মতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে ফাঁদ তৈরি হচ্ছে, তাতে পা দেওয়াটাই তাদের কর্মশক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। সুতরাং ষড়যন্ত্রে পা না দিয়ে মুসলমানদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, বিশ্ব নেতৃত্বে তাদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে প্রানান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আপনি কী মনে করেন?

উত্তর ঃ আমিতো শেষোক্ত চিন্তাধারার সাথেই একমত। যারা ষড়যন্ত্রই সবকিছু মনে করে, আমি তাদের সাথে মতানৈক্য পোষণ করি।[১]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহাবীদের মত নীতিবান হতে হবে

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হোভারের যুগে মদ নিরোধ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। তার বিস্তৃত রিপোর্ট পড়ে দেখ, কত বুদ্ধি-কৌশল, কত প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালানো হলো, কত কোটি ডলার ব্যয় করা হলো, জীবন সাধনা করা হলো, মারাত্মক ক্ষতির বর্ণনা দিয়ে তা বর্জনে উৎসাহিত করা হলো। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সমস্যার সমাধান না হয়ে আরো জট পাকিয়ে গেল। মদখোরদের যেন জিদ চড়ে গেল; না, মদ ছাড়া যেতেই পারে না! অবশেষে প্রেসিডেন্ট ও সরকারকে হার মানতে হলো। মদখোররা হার মানল না।

প্রতিপক্ষে আসুন, সাহাবীগণের (রা) যুগে জীর্ণ চাটাই ও হোগলায় উপবেশন করে আল্লাহ পাকের বান্দা রাসূল আকরাম (সা) ঘোষণা করলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ, মদ, জুয়া, প্রতিমা (দেবী) ও লটারী, তীর, (এ সবই) অপবিত্র, পঙ্কিলতা ও শয়তানী কাজ-কারবার। তাই তা থেকে দূরে সরে থাক, যাতে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হও।'

১. কুয়েতস্থ সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'আল-মুজতামায়া ঃ ১৩৩৮ নং সংখ্যায় প্রদত্ত আল্লামা নদভীর একান্ত সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত।

এ ঘোষণার ধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই প্রতিধ্বনি এল 'ইনতাহাইনা, ইনতাহাইনা' অর্থাৎ 'ছেড়ে দিলাম, ফিরে গেলাম'। প্রত্যক্ষদর্শীরা মদীনার তখনকার পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছে, ওষ্ঠের গণ্ডি ছাড়িয়ে যে মদ মুখ গহ্বরে প্রবেশ করেছিল, তাও আর সামনে এগুতে পারেনি। এক বিন্দুও নয়, তখনই উগরে ফেলা হয়েছে, যেখানে বসা ছিল সেখানেই উগরে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা তার বিবরণ দিয়েছে, এ ঘোষণার পর মদীনার অলি-গলিতে শরাব প্রবাহিত হতে লাগল, যেমন পানি প্রবাহিত হয়ে থাকে। এবারে আসুন পরবর্তী ইতিহাসে, মহান খলিফা হযরত উমর (রা) এর খিলাফতকালে। তখন রোম, পারস্য ও সিরিয়া মুসলমানদের পদানত, সম্পদ প্রাচুর্যে ঢল নেমেছে, বহির্বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথেও পরিচিতি ঘটেছে। কিন্তু শরাব পান করার ঘটনা ক'টি ঘটেছে?

আজ অভাব সে বস্তুটির, যা সাধন করতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা পরিস্থিতির আমূল রদবদল ঘটাতে পারে, তা হলো ইসলামী সীরাত ও ঈমানী চরিত্র গ্রহণ করা। সম্মিলিতভাবে সে প্রয়াস চালাতে পারলে তার সুফল তো হবে অভাবনীয়। আলহামদুলিল্লাহ! বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেহনত শুরু হয়ে গিয়েছে। আস, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিবেদিত হই, সবাই মিলে সম্মিলিত কর্মসূচীও গ্রহণ করি।[১]

নেতৃত্ব আপনাকে খুঁজবে

আপনি সততা ও সত্যবাদিতা অর্জন করুন। নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করুন। সহমর্মিতা-সমবেদনায় গুণান্বিত হোন, আপনাদের মাঝে জন্ম লাভ করুক মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাগ্রত হোক দেশরক্ষার পরিপূর্ণ চিন্তা ও সংকল্প। তা হলে তখন এটা জোর জবরদস্তির বা অবাস্তব ব্যাপার হবে না। আল্লাহর বিধান তো রয়েছেই, মানব স্বভাবের বিধান হিসেবে আমি তো জোর গলায় বলতে পারি, আপনাদের কাছে এ প্রস্তাব নিয়ে আসা হবে, বার বার অনুরোধ-খোশামোদ করা হবে-দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে, আপনারাই এর বিহিত ব্যবস্থা করুন, শাসনভার গ্রহণ করুন। কারণ এ গাড়ী আর চলছে না। এটাই মানব প্রকৃতি। মানুষ আপনাকে পছন্দ করে, আপনার হাতে কাজের দায়িত্ব দিতে চায়, তাদের সময় বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা করে আপনার অধীনে পরিচালিত হতে চায়। মানুষের এ স্বভাব চিরন্তন। যখন তারা জেনে ফেলবে, আপনাকে দিয়েই তাদের কাজ সমাধা হতে পারে, আপনিই তাদের সমস্যার সমাধান দিতে পারেন। তা হলে

১. আল্লামা নদভী (র)-এর বক্তৃতা সংকলন' প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯-১৩০।

কোথায় থাকবে জাতিভেদ, বর্ণভেদ! কোথায় তলিয়ে যাবে গোত্র-গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িকতা! সকলেই এক বাক্যে অনুরোধ করবে, প্রস্তাব করবে, আপনিই দায়িত্বভার গ্রহণ করে শেষ রক্ষা করুন![1]

তারুণ্যের উপহার

এক. চরিত্র গঠন করুন ঃ প্রথম কথা, সর্বাগ্রে ব্যক্তি চরিত্র গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করুন। এ ছাড়া সফলতা লাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের ইসলামী আন্দোলনগুলোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি ও দুর্বলতা, ব্যক্তি চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। ফলে আন্দোলনের উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে তরুণরা হিম্মত হারিয়ে ফেলে এবং আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে কিংবা পরিচালিত হয় ভ্রান্ত পথে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহ ও নববী আদর্শের ছাঁচে তরুণদের জীবন ও চরিত্র গঠিত হলে সে আন্দোলনের সফলতা নিশ্চিত। তা কখনো ঝিমিয়ে পড়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

দুই. আত্মসমালোচনা করুন ঃ দ্বিতীয় কথা হলো, আপনাদেরকে আত্মসমালোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ যুগের একটি বড় দোষ, অন্যের ছিদ্রান্বেষণে আমাদের আগ্রহের কোন কমতি হয় না। অথচ নিজেকে মনে হয় যেন শিশির ধোয়া দূর্বাঘাস। বর্তমান সমাজে দর্শন ও রাজনীতি আমাদের মধ্যে এমন এক অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে আমরা থাকি সম্পূর্ণ বেখবর, অথচ অন্যের দোষত্রুটির ওপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সর্বদা। 'অমুক দল এই করেছে,' 'অমুক ব্যক্তি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে'–এই আমাদের দিন-রাতের জপমালা। ফলে আত্মসমালোচনা করার, সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজের দোষত্রুটিগুলো খুঁজে বের করার ফুরসত কারোই হয় না বড় একটা।

তিন. ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দান ঃ তৃতীয় কথা, নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের তুলনায় ইতিবাচক কর্মকাণ্ডকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং উভয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে এগুতে হবে। সব কিছুকেই সমালোচনার চোখে দেখার ক্ষতিকর মানসিকতা যেন আপনার মধ্যে অনুপ্রবেশ না করে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। উম্মতের কোন একটা অংশের কাছে আপনারা দীনের আলো পান, তাদের সান্নিধ্য যদি আপনাদের মধ্যে ঈমানের অনুভূতি জাগ্রত করে, নামাযের প্রতি প্রেম-অনুরাগ বৃদ্ধি করে, তা হলে ততটুকুকেই আল্লাহর নি'য়ামত মনে করুন। সেইটুকু নিজেদের মধ্যেও আহরণ

১. আল্লামা নদভী (র)-এর বক্তৃতা সংকলন' প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ১৩২।

করার চেষ্টা করুন। এই বলে তাদের অবজ্ঞা করা উচিত নয়, 'দীনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি তাদের নেই; সুতরাং তারা দীনের সত্যিকার ধারক ও বাহক নয়, তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কারণ একমাত্র সালাতই দীনের একটা বিরাট অংশ। হাদীস শরীফে সালাতকে বলা হয়েছে দীনের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। সুতরাং তাদের সান্নিধ্যে এসে যদি প্রাণবন্ত নামায আপনি শিখে যেতে পারেন, সিয়ামের আত্মিক স্বাদ অনুভব করতে পারেন তাহলে মনে করতে হবে জীবন গঠনের দুঃসাহসী অভিযাত্রায় আপনি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। সুতরাং এটা অবজ্ঞার বিষয় নয়।

চার. ব্যাপক অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করুন ঃ চতুর্থ কথা, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নে এখন থেকে আপনাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। সুগভীর ও সুবিস্তৃত জ্ঞানই দীনের পথে আপনাদের এ বিপদসংকুল অভিযাত্রাকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করবে। আপনাদের সরাসরি পরিচিত হতে হবে ইসলামের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহর সাথে। একটা কথা মনে রাখবেন, আরবী ভাষায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা ছাড়া দীনের কোন মৌলিক বিষয়ে আস্থা ও নির্ভরতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য ও ভ্রান্তিমুক্ত সব ধরনের দীনী সাহিত্যই আপনাদের অধ্যয়ন করা উচিত। উম্মাহর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামই হচ্ছেন সর্বাঙ্গীণ ও পূর্ণাঙ্গ মডেল। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে দীনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে একক মডেল হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, ইনিই সর্বশেষ মডেল। সুতরাং অন্য কোন মডেলের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই অন্য কোন সাহিত্য বা রচনাসম্ভারের। এ ধরনের সংকীর্ণতা আপনার মত তরুণ ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের অন্তত থাকা উচিত নয়।

জীবনের শুরু থেকে আমার ব্যক্তিগত রুচি এটাই এবং অন্যদেরও আমি এই পরামর্শই দিয়ে থাকি। অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বৈচিত্র ও ব্যাপকতা অবশ্যই থাকা উচিত এবং যে কোন ভালো লেখাই পড়ে দেখা উচিত। তবে এতটুকু যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে হবে যাতে পঠিত বিষয়ের ভালমন্দ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

হৃদয় থেকে বলছি

পূর্ণ আন্তরিকতা ও কল্যাণ কামনায় স্নিগ্ধতা নিয়ে ওপরের কথাগুলো আমি আপনাদের বলেছি। আপনাদের জন্য আমার হৃদয়ে স্থান রয়েছে, রয়েছে গভীর মর্যাদাবোধ। হযরত উমর (রা) এর একটি আবেগপূর্ণ বক্তব্য সব সময় আমার মনে দোলা দেয়। বিশিষ্ট সাহাবীদের এক মজলিসে হযরত উমর (রা) একবার বললেন ঃ আসুন, আজ আমরা আল্লাহ্র দরবারে যার যার মনের বাসনা পেশ করি। কেউ

আল্লাহ্র পথে অকাতরে ব্যয় করার বাসনা প্রকাশ করলেন, কেউ বা অধিক ইবাদতের তাওফীক প্রার্থনা করলেন। কিন্তু হযরত উমরের পালা এলে তিনি বললেন ঃ আমার স্বপ্ন, মদীনার ঘরে ঘরে খালিদ ও আবূ উবায়দার মত বীর সন্তান জন্ম নেবে। আর গোটা দুনিয়ায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের আমি পাঠিয়ে দেব দিকে দিকে। আজ এ আশা আমরা কাদের কাছে করতে পারি? আপনাদের মত অরুণ প্রাতের তরুণ দলের কাছেই তো!

পরিশেষে আমি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করি এবং আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার মনের ব্যথা খুলে বলতে পেরে। বদনজর থেকে আল্লাহ্ আপনাদের হেফাজত করুন এবং আপনাদের মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে যথাস্থানে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।[১]

সমাপ্ত

১. আল্লামা নদভী (রহ.)-এর বক্তৃতা সংকলন' প্রাচ্যের উপহার' শীর্ষক গ্রন্থ হতে উৎকলিত, পৃষ্ঠা ঃ ৩৩২-৩৩৫।